চিত্রগ্রাহক ও চিত্র পরিচালক নীতিন বোস

জীবন তাঁর শুরু হয়েছিল ত্রিশ দশকের গোড়ায়, চলচিত্রের আঙিনায় পা রেখে। সেই থেকে আত্মপ্রগাঢ়তায়, আত্মমর্যাদায় ও আত্মশিক্ষায় কলকাতা ও বোম্বাই চলচিত্র শিল্প জগৎকে দেখেছেন। বিশেষভাবে রোমান্টিক ছায়াছবির নিরিখে, তিনি সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁর তুলনা, অতি সামান্যই রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। ত্রিশ দশক মানে ভারতীয় সিনেমা তখন ঠিক শৈশব থেকে পা রাখছে কৈশোরে। বলা যায়, হাঁটি হাঁটি পায়ে চলচ্চিত্র তখন বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে। গোড়ায় সেকালে যেসব ছায়াছবি সৃষ্টি হত, তা মূলত পৌরাণিক বিষয়ের কথা মাথায় রেখেই চিত্রমালায় ঠাঁই পেয়েছে। পুরানের সেই চিরপরিচিত গল্পকাহিনির মধ্যেই ভারতীয় সমাজের মন ও মননের আকর্ষণ নিবদ্ধ ও নিবিষ্ট ছিল। তার বাইরে তখন যা কিছু সাধারণভাবে ছিল, সে সকল বিষয় সাধারণ জনের কাছে যেমন ঔৎসুক্যের কারণ ছিল না, তেমনি বোধগম্য হওয়াটাও ছিল কঠিন। আবার অন্যদিকে সরাসরি বাস্তববাদী সামাজিক আখ্যান বিস্তার করার ক্ষেত্রে, বাধা না থাকলেও, তেমনভাবে কেউই ভাবিত ছিলেন না। হয়তো-বা কারো মনে থাকতে পারে, দর্শকের চাহিদার ক্ষেত্রে অভাব ঘটলেও ঘটতে পারত—তাঁদের গ্রহণযোগ্যতায়। তাই সেসব কথা নিশ্চিত বুঝেই ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে, যথাযোগ্য অবদানে যিনি প্রথম অগ্রসর হয়েছিলেন সেই মারাঠি মানুষটি—তিনি হলেন দাদাসাহেব ফালকে। তিনি তখনই বুঝতে পেরেছিলেন—পথিকৃৎরূপে কর্মকাণ্ডের প্রথম পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত। তিনি অবশ্যই জানতেন দর্শকের অন্তরাত্মার চাহিদা এবং তাদের সেন্টিমেন্ট। সে কারণেই তিনি ভারতীয় পুরাণ-এর বহুচর্চিত ও জনপ্রিয় আখ্যানের ভেতর, অসীম ত্যাগের প্রতীক চরিত্র, হরিশ্চন্দ্রকেই নির্বাচিত করেন ১৯২৩ সালে। ভারতের প্রথম কাহিনিচিত্র 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' সৃষ্টি করে সাহিত্য-নির্ভর চলচ্চিত্রের মান্যতা দেন। এর পর ১৯১৯ সালে দাদাসাহেব ফালকেই বাংলা ভাষায় প্রথম ফিচার ফিল্ম 'বিল্বমঙ্গল' নির্মাণ করেছেন। এছাড়াও তিনি ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও চরিত্রকে কেন্দ্র করে ছবি নির্মাণ করেছেন। পরবর্তীকালে ভারতীয় সিনেমায় ধীরেন গাঙ্গুলির মতো বিশেষ ব্যক্তিত্ব, যিনি মূলত ডি. জি. নামেই সুবিখ্যাত ছিলেন, একাধারে অভিনেতা আর অন্যদিকে পরিচালকরূপে নির্বাক যুগে অজস্র স্বল্পদৈর্ঘ্য ছায়াছবির জন্ম দেন—যা সংখ্যার দিক থেকে প্রায় ১২৬টির মতন। ১৯২২ সালে 'বিলেত ফেরৎ' নামে এক চমকপ্রদ আধুনিক বিষয়ে ছবি তৈরি করে জনপ্রিয়তা লাভ

করেন। ১৯১৯ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে তিনি যেসব ছবি তৈরি করেন তার মধ্যে রয়েছে পতিভক্তি (১৯২২), সোল অভ স্লেভ (১৯২৩), মোহিনী (১৯২২) ইত্যাদি ইত্যাদি।

ত্রিশ দশকের শুরুটা ছিল বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সময়। একদিকে অনাদিনাথ বোস কর্তৃক অরোরা ফিল্ম করপোরেশন স্থাপিত হয়। সেই বছরই 'পূজারী' ছবি রিলিজ করে এবং অন্যদিকে ধীরেন্দ্রনাথ সরকারের উদ্যোগে 'চিত্রা' সিনেমা হল যেমন তৈরি হয় তেমনি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়ো স্থাপিত হয়।

১৯৩১ সালে কালীপদ দাস অভিনীত ও পরিচালিত সেকালের অতি জনপ্রিয় নির্বাক কৌতুক চিত্র 'জামাইবাবু' আত্মপ্রকাশ করে। এই ১৯৩১ সালেই ভারতে প্রথম টকি (সবাকচিত্র) সিনেমা অর্দেশির ইরানী পরিচালিত 'আলম আরা' প্রকাশের কয়েক সপ্তাহ পরই, অমর চৌধুরী পরিচালিত প্রথম বাংলা সবাকচিত্র 'জামাই ষষ্ঠী', ক্রাউন সিনেমা হলে রিলিজ হয়। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ও পরিচালিত 'নটীর পূজা' ছবিটি চলচ্চিত্রায়িত হয়। চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং নীতিন বোস। প্রযোজক ছিল নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়ো কোম্পানি। সেখানে তখন যুক্ত ছিলেন সুবিখ্যাত চিত্র পরিচালক ডি. জি. ও দেবকী বোস। কলকাতার অন্যান্য স্টুডিয়োতেও রমরমা করে তৈরি হয়ে চলেছে নানান বিষয়ের ছায়াছবি। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সুদক্ষ অভিনেতা, যোগ্য কলাকুশলী ও প্রথিতযশা পরিচালকের সমাগম যেমন হয়েছে, তেমনি চলচ্চিত্রের পক্ষে উপযুক্ত ইকুইপমেন্ট ও প্রযুক্তিবিদ্যাকেও যথাসম্ভব ব্যবহার ও সংগ্রহের কাজে সকলেই সচেষ্ট ছিলেন। সেই সময় কলকাতা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ কিছু শিক্ষিত ও মেধাবী যুবক চলচ্চিত্র তৈরির কাজে কলাকুশলীরূপে যোগ দেন। বিশেষত ফোটোগ্রাফিক বিভাগে প্রত্যক্ষ কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে পরবর্তীকালে তাঁরা প্রত্যেকেই এক-একজন ইন্ডাস্ট্রির সেরা ক্যামেরাম্যান হয়ে ওঠেন। সেখানে নীতিন বোসের মতো মানুষ ছাড়াও এই পথে এসেছিলেন একঝাঁক নবীন প্রতিভা। বিমল রায়, অজয় কর, অসিত সেন, নিমাই ঘোষ, দীনেন গুপ্ত, রামানন্দ সেনগুপ্ত, সুব্রত মিত্র, সৌমেন্দু রায়, বারিন সাহা, বেবী ইসলামের মতো আরো বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান আলোকচিত্র শিল্পী। এঁরা প্রত্যেকে সিনেমা নামক শিল্পটির প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ বোধ করেন মুখ্যত ফোটোগ্রাফির কারণে। ক্যামেরা নামক যন্ত্রটি ছিল তাঁদের কাছে কথা বলার ও ভাব প্রকাশের এক মোক্ষম অস্ত্র। এঁদের সকলের প্রথম জীবনে স্থির চিত্রে হাতেখড়ি হলেও, পরবর্তীকালে এঁরা মুভি ক্যামেরাকে হাতিয়ার করে নিজেদের প্রশিক্ষিত করে শুধু ক্যামেরাম্যানরূপে প্রতিষ্ঠিতই করেন নি—রামানন্দ সেনগুপ্ত, সুব্রত মিত্র ও সৌমেন্দু রায় বাদে, উপরিউক্ত সকলেই কমবেশি চিত্র-নির্দেশনার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, এবং নিজ নিজ ঘরানায়

চিত্র পরিচালকরূপে সফলও হয়েছেন। এঁদের একাধিক পরিচালিত ছবির আবেদনে দর্শক অনাবিলভাবে সাড়াও দিয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সেইসমস্ত বাঙালি আলোকচিত্র শিল্পীদের অন্যতম হলেন—নীতিন বোস। একদিকে সফল সিনেমাটোগ্রাফার আর অন্যদিকে ছিলেন সফল চিত্র নির্দেশক। শুধু কলকাতাতেই নয়, বোম্বেতেও সর্বভারতীয় হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে ছিলেন কৃতী ও দক্ষ শিল্পী। কলাকুশলীরূপে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করেছেন, বারবার—প্রতিটি সৃষ্টির ভেতর দিয়ে।

নীতিন বোসের নিজের স্বীকারোক্তি—তাঁর প্রচণ্ড ভালোবাসা হল ফোটোগ্রাফি। এবং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না, যে তার এই ভালোবাসা ও আকর্ষণের পেছনে উত্তরাধিকার সূত্র একটা ছিল। সেটি হল তাঁর পিতার উৎসাহ দান ও অনুপ্রাণিত করার বিশেষ মন। পিতা হেমেন্দ্রমোহন বোস ছিলেন অবিভক্ত বাঙালির একজন বড়ো মাপের বাঙালি শিল্পপতি। প্রখ্যাত কুন্তলীন প্রেস এবং টকিং মেশিন হল (প্যাথেফোন রেকর্ডিং সিস্টেম্স-এর ডিস্ট্রিবিউটর)-এর প্রধান কর্ণধার ছিলেন। তিনি ফোটোগ্রাফিক চর্চার গুণগ্রাহীও ছিলেন। একটি মুভি ক্যামেরা সংগ্রহ করে কিশোর নীতিনের হাতে তুলে দিয়ে এক সময় উৎসাহিত করেছিলেন। পুত্র ছবির প্রতি যাতে আগ্রাহান্বিত হয় তার জন্য পিতার সদাজাগ্রত খেয়াল ছিল। স্কুল পাঠ্যের বাইরে নীতিনের কোনো আগ্রহ বা উদ্যম পূরণে কোনো কিছুতেই কার্পণ্য করেন নি এবং কোনো একটিরও অভাব রাখেন নি। পিতার এই উদ্দীপনার ফলস্বরূপ নীতিনও তার মর্যাদা দিয়ে যথাযোগ্য দক্ষতা সহকারে প্রথম প্রথম ঘরোয়া ছবি তৈরির মাধ্যমেই নিজেকে উন্নীত করার চেষ্টা করেছেন।

১৯২১-২২ সাল নাগাদ পুরীর রথযাত্রা, ত্রিপুরার মহারাজার হস্তীশিকার নিয়ে নিউজ রিল তৈরি করে ইন্টারন্যাশনাল নিউজ রিল কর্পোরেশন এবং ফক্স ফিনোগ্রামকে বিক্রি করেছেন। কিন্তু পেশাগত ফিচার ফিল্মে ফোটোগ্রাফার হিসেবে বলা যায় তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯২৬ সালে জয়গোপাল পিল্লাই-এর 'পুনর্জন্ম' ছবিতে। এরপর তিনি নিজের টেকনিক্যাল ও এস্থেটিক্যাল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিকাশের কারণে অনেক নামী ও অনামী চিত্রপরিচালকের সঙ্গে ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করেছেন। অরোরা ফিল্মস-এর জন্য ফিচার ছবি ছাড়াও ইন্ডিয়ান সিনেমা আর্টস, শিশিরি ভাদুড়ী এবং ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্র্যাফট-এর চিত্র নির্মাণ কাজের সঙ্গে বিভিন্ন সময় যুক্ত হয়েছিলেন।

নীতিন বোসের সমসাময়িককালে যে দুজন সুবিখ্যাত মহান চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাঁরা হলেন দেবকীকুমার বোস এবং প্রমথেশ বড়ুয়া। যাঁরা নিজস্ব শৈলীতে চিত্র সৃষ্টি করে, আপন আপন প্রতিভায় বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেই সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রার দুটি ঘরানার জন্ম দিতে সমর্থ হয়েছেন। চিত্র দর্শনের দিক থেকে দুটি

পরিচালকের উপস্থাপনার যথেষ্ট অমিল বা পার্থক্য থাকলেও বাঙালিয়ানার প্রভাবকে দুজনেই ষোলোআনা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। নীতিন বোসের কিছু ছবিতে সেই প্রকার থাকলেও তাঁর সব ছবির ক্ষেত্রে একথা ঠিক ঠিক খাটে না—কেননা, তিনি সর্বভারতীয় গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতে কাঠামোকে সেভাবেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাই তাঁর ছবিগুলি চিহ্নিত হয়ে আছে, পূর্বসূরিদের আঞ্চলিক ভাবধারায় না হলেও, গভীর দেশজ ও জাতীয় পটভূমিকার আবেগে স্ফুরণে। কেননা মনে রাখতে হবে হিন্দি ভাষায় ছবি করার অর্থ—জাতীয় ভাষা হিসেবে সমগ্র ভারতবাসীর কাছে পৌঁছে যাওয়া। আর ভারতবর্ষ হল এমন দেশ যেখানে বহু ভাষাভাষীর মানুষের বাস—বহু ধর্ম, বহু জাতি, বহু কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সম্মিলিত সহাবস্থান ও তার মেলবন্ধনে আবদ্ধ। ভারতবর্ষের নিজস্ব একটা বিশেষ ঐতিহ্য-পরম্পরা আছে, যা ভারতবাসী হিসেবে প্রত্যেক নাগরিকেরই আশৈশব লালিত মানসিকতার সঙ্গে যুক্ত। পারস্পরিক ও সামাজিক মানুষ হিসেবে কেউ সেই আবেগ-অনুভূতি ও উপলব্ধিগুলিকে অস্বীকার করতে পারবে না। সেই মেলবন্ধন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় গতানুগতিক সর্বজনীন ভাবধারাকে ধারণ করেই, পরিকল্পিত হিন্দি ভাষার ছবিকে জনগণের কাছে পরিবেশন করতে হবে। যেখানে জাতি নির্বিশেষে প্রত্যেকের ভাবনা সম-আদর্শের ভিত্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। চিত্রপরিচালককে সকলের কাছে পৌঁছোতে হলে কমন অ্যাজেন্ডার ভিত্তিতেই তাঁকে যেতে হবে। তার জন্য বিষয়ের আবেদন, সকলের কাছে এক হলেও আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য কেমন হবে, সেটা চিত্র পরিচালককেই ঠিক করতে হয়। সুতরাং সেদিক থেকে নীতিন বোসকে বলা যায় শতকরা একশো শতাংশ না হলেও অনেকাংশেই সফল নিজের চিন্তা বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে। ১৯৩০ সালে নীতিন বোস ফিল্ম মেকিং-এর উদ্দেশ্যে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োতে যোগ দেন প্রধান টেকনিশিয়ান রূপে। পরবর্তীকালে তিনি শুধুমাত্র একজন কলাকুশলী হিসেবেই নন, একজন প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ্ হিসেবেও স্টুডিয়োতে ছায়াছবি তৈরির কাজে—যেখানে যেভাবে যেমন উন্নতি সাধনের প্রয়োজন, সেভাবে তার জন্য যথাসম্ভব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে, নানাভাবে প্রযুক্তি মানের উন্নতি ঘটিয়েই শুধু ক্ষান্ত থাকেন নি, সঙ্গে সঙ্গে একদল নবীন যুবসম্প্রদায়কে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্যামেরা-আলো-ইলেকট্রিক এবং সহায়ক বিষয়-সম্পর্কিত দিকগুলির খুঁটিনাটি নিয়ে অবহিত করেন। যাতে পরবর্তী সময়ে তারাও নিজেদের অবদানের সহজেই কর্মসফল হয়ে স্বীকৃতি আদায় করতে পারেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা-যাঁরা ছিলেন উল্লেখযোগ্যভাবে দুজনের নাম হল ইউসুফ মুলজি এবং বিমল রায়, যাঁদের সমৃদ্ধ কাজের অবদানে ও স্বীকৃতিতে একসময় বাংলার গর্ব ভারতের কাছেও শ্লাঘনীয় হয়েছিল।

নীতিন বোসের জীবনে চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রথম কর্মপ্রয়াস ছিল একটি তথ্যচিত্র—১৯২১ সালে বেলজিয়াম এমপেরার-এর ভারতবর্ষে আগমন-সম্পর্কিত বিষয়

নিয়ে। এবং পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, পেশাগতভাবে সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে শুরু হয়েছিল 'পুনর্জন্ম' ছবি থেকে। কিন্তু নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে প্রথম চিত্রগ্রাহক হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন ১৯২৮ সালে। নরেশচন্দ্র মিত্র পরিচালিত 'দেবদাস' ছবি দিয়ে। তাঁর এই প্রারম্ভিক উপস্থিতি আত্মপ্রকাশেই ভবিষ্যৎ জীবনে অসীম দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। যার ফলে ১৯৩২ সালে নৃত্যনাট্য-ভিত্তিক এক ঐতিহাসিক ছবি 'নটীর পূজা'র আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন—যে ছবির মূল রচনাকার এবং পরিচালক ছিলেন বিশ্বখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছবিটি নৃত্যনাট্য আঙ্গিকে এক ঐতিহাসিক উপাখ্যান। এখানে একটি তথ্য উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক বলে মনে করি—তা হল ১৯২৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'দেবদাস' উপন্যাসটি ভারতীয় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় চিত্রায়িত হলেও নরেশ মিত্র নির্দেশিত ও নীতিন বোস কর্তৃক ছবিটিই ছিল প্রথম প্রয়াস। এই কাহিনি নিয়ে পাকিস্তানেও উর্দু ভাষায় দুবার যথাক্রমে—১৯৬৫ ও ২০১০ সালে ছবি হয়েছে। বাংলাদেশে একবার ১৯৮২ সালে, এছাড়া হিন্দি, অসমীয়া, তেলেগু, মালয়ালম ভাষাতেও নানাসময় হয়েছে। কলকাতাতেই বাংলা ভাষায় প্রায় পাঁচবার চিত্রায়িত হয়েছে। তবে নির্বাক যুগে একবারই হয়েছে নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত নরেশ মিত্র ও নীতিন বোসের যথাযথ অবদানে। দেবদাসের ভূমিকায় ফণী বর্মা, পার্বতীর চরিত্রে তারকবালা ও চন্দ্রমুখীর ভূমিকায় অভিনয়ে ছিলেন মিস্ পারুল ও নীহার বালা।

নিউ থিয়েটার্সে যোগদানের শুরু থেকেই নীতিন ক্যামেরা ডিপার্টমেন্টে ছিলেন চিফ্ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসর। দেবকী বোসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবির আলোকচিত্রী তিনি ছিলেন, যেমন চণ্ডীদাস (১৯৩২), মীরাবাঈ (১৯৩৩)। এছাড়া প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'দেনা-পাওনা' (১৯৩১), 'মোহাবৎ কি আঁসু', 'সুবাহ কা সিতারা', ভাবনানীর 'শকুন্তলা' (১৯৩১)। এই সমস্ত ছবিতে কাজের সুবাদে শুধু উৎকৃষ্ট ক্যামেরাম্যান রূপেই নয় বিভিন্ন পরিচালকের কাজের রীতি, পদ্ধতি দেখার ফলেও নিজেকে ভবিষ্যৎ চিত্র পরিচালকরূপে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন—তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না।

নীতিন বোস সারা জীবনে বাংলা ও হিন্দিতে কমবেশি ৩৬টি ছবির চিত্র পরিচালক ছিলেন। এর মধ্যে কলকাতায় যেমন নির্দেশনার কাজ করেছেন তেমনি পরবর্তীকালে তৎকালীন বোম্বেতে গিয়েও বহু বিখ্যাত সিনেমার চিত্র নির্মাণের ভার গ্রহণ করেছিলেন। সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে তিনি প্রায় ২০টি ছবির দায়িত্ব পালন করেছেন। কাহিনিকার ও চিত্রনাট্যকাররূপে ১১টি ছবিতে তাঁর অবদান রয়েছে। ক্যামেরা ও ইলেট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের হয়ে তিনটি ছবি করেন।

নীতিন বোস-কৃত চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে ওঁর পারিবারিক পরিচিতি এবং আত্মীয়তার সূত্র সম্পর্কিত কিছু কথা জানা যাক।

নীতিন বোস-এর জন্ম ২৬ এপ্রিল ১৮১৭ সালে কলকাতায়। পিতা হেমেন্দ্রমোহন বোস, মাতা শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী। তিন ভাইয়ের ভেতর নীতিন বড়ো। মেজোভাই মুকুল বোস—যিনি প্রকৃত অর্থেই ছিলেন একজন সফল সাউন্ড রেকর্ডিস্ট। সারাজীবন দাদা নীতিনের প্রায় সব ছবিতেই অডিয়ো রেকর্ডিং এর কাজে জড়িয়ে ছিলেন। আর ছোটো ভাই কার্তিক বোস ছিলেন সুবিখ্যাত ক্রীড়াবিদ। খেলাধুলার জগতে বিশেষভাবে ক্রিকেটের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত রেখেছিলেন। তিন ভাই-ই আপন আপন জগতে ছিলেন প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব, এককথায় জুয়েল। মা মৃণালিনী দেবী ছিলেন সেই অর্থে রত্নগর্ভা। পৈত্রিক সূত্রে মৃণালিনী হলেন বাংলার জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক এবং বহুবিধ কর্মোদ্যোগ ও সংস্কৃতির কর্ণধার উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বোন। তিনি আত্মীয়তা সূত্রে সুকুমার রায়ের পিসিমা এবং সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুমা। অতএব নীতিন বোস হলেন সত্যজিতের সম্পর্কে কাকা। 'সবাক যুগে নিউ থিয়েটার্সের হাতি-মার্কা ছবির যখন খুব নাম-ডাক, আমার দুই কাকা নীতিন ও মুকুল বোস যখন পরিচালক, ক্যামেরাম্যান ও শব্দগ্রহণ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন থেকে মাঝে মাঝে আমার বাংলা ছবি দেখা শুরু। হলিউডের তখন স্বর্ণযুগ চলছে।' ('বিষয় চলচ্চিত্র' পৃ. ৩৭)

১৯৩৪ সালটা নীতিন বোসের জীবনের মোড় ফেরানোর এক বিশেষ স্মরণীয় সময়। ১৯৩৩ সালে দেবকী বোস যখন 'সীতা' (১৯৩৪) ছবি তৈরি করার কারণে স্বল্প সময়ের জন্য নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে ম্যাডান থিয়েটার্সে যান, ঠিক সেই সময় নীতিন বোসের কাছে চিত্র নির্দেশনার দায়িত্ব পালনের একটা সুযোগ আসে। নিউ থিয়েটার্সের প্রোডিউসার তথা কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকারের কাছ থেকে আবেদন আসে নীতিন বোসের কাছে চিত্রপরিচালকরূপে কর্মভার গ্রহণ করার জন্য। তিনি দ্বিধান্বিত না হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চিত্র-পরিচালকের ভার গ্রহণ করেন। ঠিক পরের বছর ১৯৩৪ সালেই দেবকী বোস-কৃত বাংলা ছবি 'চণ্ডীদাস' (১৯৩২) হিন্দি ভাষায় নীতিন বোস পুনর্নির্মাণ করেন। বাংলা ছবিটির আলোকচিত্রীও ছিলেন নীতিনবাবু। ওই ছবির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকার কারণে চিত্র-নির্মাণের সমস্ত দিকগুলি তাঁর নখদর্পণে ছিল। তাছাড়াও দেবকীবাবুর সঙ্গে কাজ করার সুবাদে তাঁর ঘরানা, তাঁর নিজস্ব শৈলী সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। গোড়া থেকেই দেবকী বোস ছিলেন নিউ থিয়েটার্সের সংগঠনের মধ্যমণি এবং গুরুত্বপূর্ণ একজন চিত্র-পরিচালক। তাঁর পরিচালনায় ওই সময় বাণিজ্যিক সাফল্যই শুধু নয়, ঐতিহাসিকভাবেও বেশ কিছু ছবি সর্বার্থে সার্থক হয়েছিল। তাঁর কাজের ধারাবাহিকতার মেজাজ নীতিন বোসের জানা ছিল। হয়তো তাই নীতিনবাবু চিত্র নির্দেশনার শুরু থেকেই দেবকীবাবুর প্রগতিশীল স্বচ্ছ ভাবনা মনে রেখে, হিন্দি ভাষায় 'চণ্ডীদাস' পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। 'চণ্ডীদাস'-এর যে বক্তব্য, তা সেই সময়ের প্রেক্ষিতে দিগ্‌দর্শন। যখন জাতপাতের বিভেদ, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা,

এবং শ্রেণিবৈষম্যের কারণে আহত ভারতবর্ষের মানুষের চেতনার মুক্তি ঘটেনি। আজকের দিনেও রামী ও চণ্ডীদাসের সংলাপ শুনলে স্তব্ধ হয়ে ভাবতে হয়—এই ছবি সেসময়ে করবার এত সাহস পরিচালক কীভাবে পেলেন! মূল কথা নিজস্ব বিশ্বাসের জায়গাটাই আসল—সেটা যত আত্মবিশ্বাসের শিকড়ে সবল হয়, প্রকাশের ভেতরেও সততার মাত্রা ক্রমশ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। দেবকী বোস এবং নীতিন বোস—দুজনের মধ্যেই সেই চেতনা অকপট ছিল বলেই, তাঁদের শিল্পকীর্তি সার্থকভাবে সফলতার স্তরে পৌঁছোতে পেরেছে। এই ছবি নিয়ে আমাদের বিশেষভাবে গর্ব হল, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত (ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব) প্রথম ভারতীয় ছবি এই 'চণ্ডীদাস'। এবং বিষয়ের তাৎপর্যে তুলনায় নিম্নবর্ণ সমস্যা নিয়ে তৈরি ছবি 'অচ্ছুৎ কন্যা' সম্পর্কে উল্লেখ করে বলতে হয়, চণ্ডীদাস-এর চার বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে তৈরি অচ্ছুৎ কন্যার বিষয়টিও ছিল এক ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে দলিত কন্যার প্রেমকাহিনি। তবে উপস্থাপনা ও সংলাপের দিক থেকে কোনো জোরালো উদাহরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। অচ্ছুৎ কন্যায় হিন্দু সমাজের জাতপাতের কুপ্রথার প্রতি কোনো বিরূপ মন্তব্য নেই, সমালোচনাও নেই।

হিন্দিতে চণ্ডীদাস-এর চিত্র নির্দেশনা ও ফোটোগ্রাফি দুটি বিভাগের দায়িত্বই নীতিন বোস যথাযোগ্য কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছিলেন বলেই, এটি নিউ থিয়েটার্সের প্রথম ও প্রধান বক্স-অফিস সফল ছায়াছবি। চলচ্চিত্রের মূল আখ্যান ছিল একজন উচ্চবর্ণ কবি-পুরোহিতের সঙ্গে নিম্নবর্ণের এক ধোপানির অসামান্য ভালোবাসার বর্ণনা। নীতিনবাবু কাহিনি বিন্যাসের ভেতর অনেক নতুন চরিত্রের এবং বিচিত্র সব অবস্থার গতি-প্রকৃতির পরিচয় ঘটান। গোটা কাহিনিকে ঠাস বুনটের মধ্যে বেঁধে রেখে, আবেগের রূপ প্রকাশ ঘটাতে সমর্থ হয়েছেন, যা তৎকালীন দর্শকের কাছে মানবিকভাবে এক উচ্চ দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেই এত আকর্ষণীয় হয়েছিল। ছবির নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন কে. এল. সায়গল এবং প্রেমিকা রামীর চরিত্রে ছিলেন উমাশশী। রাইচাঁদ বড়ালের মন মাতানো সংগীতের মূর্ছনা এই ছায়াছবিকে এনে দিয়েছিল এক অনন্য-সাধারণ সফলতা। ছবির পরতে পরতে, বিশেষত নাটকীয় মুহূর্তগুলিতে দৃশ্যের গঠন ও পরিকল্পিত রূপে যেমন সজীব ও স্বাভাবিকত্ব প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি তৎকালীন অভিনয় ও সংলাপ প্রকাশের রীতি রেওয়াজ অনুযায়ী কোথাও কোথাও যেন অতিনাটকীয়তার মাত্রা মিশ্রিত হয়েছিল। তবু বলতেই হয় উমাশশী ও সায়গলের নাটকীয় অভিনয় রীতিতে দর্শক মোহিত হয়েছে। তাঁর প্রথম পরিচালিত পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি দেখে বুঝতে পারা যায়, কেন বি. এন. সরকার নিজে একজন দক্ষ প্রযোজক। নীতিন বোসকে পরিচালকরূপে বেছে নিতে, ভুল করা তো দূরের কথা বরং বলা যায় তিনি যথাযোগ্য সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিলেন। নীতিনের সমগ্র সৃষ্টিগুলি অনুধাবন করলেই উপলব্ধি করা যায়, তাঁর

সৃজনশীল শক্তি ও প্রতিভা। প্রথম এই ছায়াছবি তাঁকে শুধুমাত্র একজন নিপুণ কারিগর শিল্পী হিসেবেই প্রতিষ্ঠা দেয়নি, নির্দেশকরূপেও তাঁর দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দর্শক অনুভব করেছে। এরপরও তিনি নিউ থিয়েটার্সের হয়ে আরো বেশ কিছু ছবি পরিচালনা করেছেন।

নীতিন বোস তাঁর চলচ্চিত্রগত পেশায়, সর্বাধিক যে অবদান গোড়ার দিকে রেখেছেন, তার বিশেষত্ব হল ১৯৩৫ সালে তাঁরই পরিচালিত প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র—'ভাগ্যচক্র' (বাংলা)-তে প্লেব্যাক সিংগিং-এর ব্যবহার চালু হয়। এবং ওই বছরই হিন্দিতে ছবিটি পুনর্নির্মাণ করেন তিনি 'ধূপছাঁও' নামে। যে ছবি আজকের ভাষায় বলা যায় 'মেগাহিট' হয়েছিল।

১৯৩৫ সালের আগে ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক সিংগিং-এর আধুনিক উন্নতমানের বিজ্ঞানসম্মত সুবিধাজনক কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। তখন যেভাবে প্রচলিত ছিল, তা পুরোপুরি এক আদিম পদ্ধতি, ভীষণ কষ্টকর এক অবৈজ্ঞানিক পথে সমাধানের রীতি। সেই প্রচলিত পদ্ধতিতে সকলে খুশি না থাকলেও বহুদিনের রেওয়াজে সকলেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু কারোরই বিকল্প কোনো পথ বা পদ্ধতি জানা ছিল না—সেজন্য পুরাতন যুগে কোনো গানকে চলচ্চিত্রে দৃশ্যায়িত করার ক্ষেত্রে যেভাবে দৃশ্য গ্রহণ করা হত, তাতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীনই হতে হত। শুধু তাই নয়, সিনেমা হলে প্রদর্শনের সময় দর্শকদের চোখে রুপোলী পর্দার মাধ্যমে ধরা পড়তে অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি। যে দোষ-ত্রুটি মোচন করার তখন আর কোনো পথই থাকত না। অতএব ত্রুটিপূর্ণ ছবিই বাজারে প্রদর্শিত হতে বাধ্য ছিল। সেটাই ছিল তখনকার চল।

একটু বলা প্রয়োজন, কেমন ছিল তখন সং পিক্চারাইজেশন পদ্ধতি? সেকালে গানের শুটিং চলাকালীন গায়ক ও বাদকের দল, যথাসম্ভব নিজেদের ক্যামেরার আড়ালে রেখে, শুটিং-এর গতি-প্রকৃতি বুঝে, ক্যামেরা এবং নায়ক-নায়িকা বা অভিনেতাদের মুভমেন্টের সঙ্গে তাল রেখে, গান গাইতে গাইতে এবং সংগীতযন্ত্র সঙ্গে নিয়ে বাজাতে বাজাতে প্রায় পাশাপাশি হাঁটতেন বা প্রয়োজনে দৌড়তেন। শুটিং-এর লোকেশন যেমনি হোক তা মাঠ, জঙ্গল, পুকুর কিংবা পাহাড়ি এলাকা হলেও পদ্ধতি একটাই ছিল। কাদামাখা পথে, পাথুরে এলাকায় বা পুকুরের মধ্যে পড়ে যাবার অনেক আপাত-হাস্যকর ঘটনা ঘটলেও অভিজ্ঞ মানুষের ব্যক্তিগত ইতিহাসের পাতায় চোখের জলে ডুবে আছে। সং পিকচারাইজেশন অথবা প্লে-ব্যাক সিংগিং-এর পদ্ধতি যতই করুণ হোক বা অমানুষিক হোক—কারোর কিছু করার ছিল না। ভাবা যায় না, শুটিং চলাকালীন একবারে শট যদি 'ও.কে' না হত, তবে 'ও.কে' না হওয়া পর্যন্ত বারবার গায়ক ও বাদকদের পুনঃপুনঃ একইভাবে অভিনেতাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়টা অব্যাহত থাকত। এবং এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে লিপ্-সিংক্রোনাইজেশন করা অর্থাৎ পিকচার ট্র্যাকের সঙ্গে

সাউন্ড ট্র্যাক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেলানোটা সম্পাদক মহাশয়ের কাছে ছিল এক দুঃসাধ্য ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার। সেকালে আউটডোর শুটিং-এর কাজে বড়ো জোর একটা মাইক্রোফোন এবং একটা বা দুটো ক্যামেরা ব্যবহার করা হত। অন্তত গানের কোনো একটা বড়ো দৃশ্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অসুবিধা হওয়াটাই ছিল তখনকার দিনে এটা স্বাভাবিক ঘটনা। একটা টানা লম্বা শটকে ইন্টারকাটিং করে, ছোটো কোনো ক্লোজ শট ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও ছিল বিচিত্র প্রতিবন্ধকতা, অথচ সেটুকু না পারলে দৃশ্য বা শটের শ্লথ গতির কারণে দৃশ্য বৈচিত্র্যের আকর্ষণও কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। গান পিকচারাইজেশনের এই অংসখ্য দোষ-ত্রুটি-প্রতিবন্ধকতাগুলি দিনের-পর-দিন চিত্রগ্রাহক হিসেবে নীতিন বোস অনুধাবন করেছেন এবং সম্মুখীনও হয়েছেন আত্ম-অভিজ্ঞানে। কোনো একটি ছবিতে নীতিন বোস লক্ষ করলেন—আউটডোর শুটিং-এর সময়, পঙ্কজ মল্লিক যখন লোকেশনে গান গাইছেন, তখন একটা অবান্তর ও অনভিপ্রেত হামিং সাউন্ড শোনা যাচ্ছে। যে শব্দ পরিবেশ-সৃষ্ট হয়ে শ্রুতিকটু শোনায়। এবং এই অবাঞ্ছিত শব্দই মূল সংগীতের শ্রুতিমধুর ধ্বনিকে যেমন ব্যাহত করে, তেমনি বিশৃঙ্খলা ঘটায়। শ্রুতিমধুর সঙ্গীতের পক্ষে যা অন্তরায়। তেমন অপ্রয়োজনীয় আওয়াজ, শব্দ, ধ্বনিকে বিরত-রাখার জন্য নীতিন বোসের সেদিন মনে হয়েছিল, এর বিকল্প পথ খোঁজার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। এরপরই তিনি ভাই মুকুল বোসের সঙ্গে পরামর্শ করে, একটা পথ আবিষ্কার করলেন—শুটিং-এর সময় গায়ককে দিয়ে না গাইয়ে যদি আগে রেকর্ডিং করে নেওয়া যায় এবং শুটিং চলাকালে সেই রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে অভিনেতার অভিনয়ের সঙ্গে ঠোঁট নাড়িয়ে যথাসম্ভব গানের কলিগুলি মেলানো যায় তবে অযথা কষ্ট-হয়রানির থেকে যেমন মুক্তি পাওয়া যাবে, তেমনি চিত্র-সম্পাদকের কাছে সিংক্রোনাইজেশনের কাজটাও যথাযথাভাবে সঠিক হতে পারে। সেইমতো মুকুল বোস র্তার দাদার সঙ্গে এক্সপেরিমেন্ট করে, আশানুরূপ ফল পেলেন। প্রযুক্তিগত এই শৈল্পিক কাজে তাঁরা দুই ভাই ভারতবর্ষে প্রথম আশাতীত সম্ভাবনায় সফল হয়েছিলেন। বাংলা ছবি 'ভাগ্যচক্র'-র একটা গানে দীর্ঘ দৃশ্য ছিল থিয়েটার স্টেজে। প্রথিতযশা গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে ছাড়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন বহু অভিনেত্রী। কৃষ্ণচন্দ্র নিজের স্বরে গান গেয়ে অভিনয় তো করেছেনই, পাহাড়ী সান্যালের ঠোঁটে তাঁর কণ্ঠ ব্যবহারও করা হয়েছিল। নারীকণ্ঠের গানগুলি গেয়েছিলেন সুপ্রভা সরকার এবং পারুল ঘোষ। এই সুপ্রভা সরকারই পরবর্তীকালে নজরুল সঙ্গীতের প্রকৃত নির্ভরযোগ্য গায়িকা ছিলেন। আর পারুল ঘোষ ছিলেন প্রখ্যাত বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষের বোন।

একই বছর ওই ছবি হিন্দি ভাষায় নীতিনবাবু তৈরি করেন 'ধূপছাঁও', একই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োর ব্যানারে। দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে প্রথম বাংলা এবং হিন্দি ছবির প্লে-ব্যাক সিংগিং-এর নতুন পদ্ধতি প্রচলন

করার সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক কৃতিত্ব নীতিন বোসের। তবে তার এই নাম ও যশের পেছনে যে মানুষটির অবদান ছিল অনস্বীকার্য, যিনি পরিচালকের ভাবনাকে সাকার করার তাগিদে নিরলস পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আপন প্রযুক্তিগত মেধার অবদানে কৃতকার্য হয়েছিলেন, তিনি হলেন নীতিনের সহোদর, মুকুল বোস। জীবনের শুরু থেকেই দাদার অনুগামী হয়ে প্রথম নিউ থিয়েটার্সে কাজে যোগদানের পর, বোম্বে চলে গিয়েছিলেন সাউন্ড রেকর্ডিস্ট হিসেবেই। নিজের উদ্ভাবনী প্রতিভা এবং প্রযুক্তিগত সৃজন ক্ষমতার অদম্য প্রয়াস ও প্রকাশকে তিনি নানাভাবে চলচ্চিত্র বিকাশের কাজে লাগিয়েছেন। আজীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

যাই হোক, তবু এটা অন্তত বলা যায় যে, 'ভাগ্রচক্র' এবং 'ধূপছাঁও' ছবির সঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সৌভাগ্য যেমন জড়িয়ে ছিল তেমনি ঐতিহাসিকভাবে অনেক মানুষের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হয়েছিল। যেমন প্রযোজক নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োর কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকার, পরিচালক নীতিন বোস, সঙ্গীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল, গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, গায়িকা সুপ্রভা সরকার, পারুল ঘোষ, অভিনয়ে কৃষ্ণচন্দ্র দে, পাহাড়ী সান্যাল এবং সর্বোপরি শব্দযন্ত্রী মুকুল বোসের নাম।

গোড়ার দিকে নীতিন বোস বেশ কিছু নির্বাক ও সবাক চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন। যেমন 'বুকের বোঝা' (১৯৩০), 'ডাকু মনসুর' (১৯৩৪)। একই বিষয় হিন্দিতে করলেন 'ডাকু মনজুর'। তবে সেই ছবিগুলি বাণিজ্যিকভাবে যেমন খুব একটা সফল হয়নি, তেমনি দর্শকদের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রেও সাড়া ফেলেনি। তবে 'চণ্ডীদাস', 'ভাগ্যচক্র', 'ধূপছাঁও'-র পর নির্দেশনার সফল দিকচিহ্ন ১৯৩৭-এ 'দিদি' যার হিন্দি রিমেক 'বড়ি বহেন' (পরিবর্তিত নাম প্রেসিডেন্ট), ১৯৩৮-এ 'জীবন মরণ' এবং 'হিন্দি রিমেক 'দুষমন'। ওই একই বছর 'দেশের মাটি' ছবি ও হিন্দিতে 'ধরতী মাতা'। এই ছবিগুলি কিন্তু রিলিজের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় হয়েছিল। শিল্পীদের অভিনয়ের বিশেষত্ব ছাড়াও গল্পের ভেতর ছিল বলিষ্ঠ ভাবনা। আর পরিচালক এই ছবিগুলির মাধ্যমে নিজেকে প্রথম সারির নির্মাতা-রূপে যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যদিও তাঁর ছায়াছবিগুলি মুখ্যত প্রেমের আখ্যানেই উপস্থাপিত, কিন্তু সেই রসের নির্মাণেই গভীরভাবে আঁকড়ে রয়েছে নায়ক, নায়িকা ও পার্শ্বচরিত্রের নানান টানাপোড়েনের সম্পর্ক এবং প্রেম, বিরহ, বিশেষত মিলনের সমস্তরকম উপকরণ বা উপাদান। এছাড়াও মনোযোগী দর্শকের কাছে ধরা পড়ে, আখ্যান বিন্যাসের ভেতর, আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরা। যার প্রেক্ষিতে সাধারণ দর্শকসমাজ নীতিনের ছবির মধ্যে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-ভালোবাসা ঘৃণা ও জিঘাংসার দ্বান্দ্বিক বোধে একাত্ম হতে পেরেছে। তারা নিজেদের যেমন আইডেন্টিফাই করতে পেরেছে, তেমনি

সামাজিক শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র ও হতাশার থেকে উত্তরণের ফলস্বরূপ, পরিচালকের সুনিপুণ মেলোড্রামাটিক সমাধানকেও আপাতত স্বস্তি ভেবে মেনে নিয়েছে। তাই হয়তো দর্শকের দিক থেকে তাঁর ছবির আকর্ষণে কখনো ভাটা পড়েনি। চিত্র নির্মাণ কর্মে নিতীন নিজেকে সৃষ্টির পথেই শুধু নিয়ে যাননি, তাঁর কর্মজীবনকেও সুনিশ্চিত করতে পেরেছিলেন দীর্ঘ সময় ধরে। ওঁর সমগ্র ছবির সংখ্যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—সেখানে বিশেষ কৃতিত্বের এবং আকর্ষণীয় চলচ্চিত্রের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়।

কলকাতা তিনি ছেড়েছেন নিউ থিয়েটার্সের কাজ করতে করতে, ১৯৪০-এ 'কাশীনাথ' তৈরি করার সময়তেই। নিউ থিয়েটার্সের প্রধান চালিকাশক্তি ও চিন্তাশীল মানুষ বি. এন. সরকারের সঙ্গে নীতিন বোসের কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কিছু মতপার্থক্য হয়। অথবা ধরে নেওয়া যেতে পারে, কোনো ভুলবোঝাবুঝি হবার ফলেই, পরস্পরের ভেতর মনান্তর ঘটে। যে কারণে নীতিন 'কাশীনাথ' ছবি শেষ করার পরমুহূর্তেই নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে যান। আর কখনোই ফিরে আসেন নি সেখানে এবং কলকাতা ছেড়ে পাড়ি দিলেন ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের পীঠস্থান বোম্বে নগরীতে। সেখানে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যোগ দিয়ে ১৯৪৭ সালে বোম্বে টকিজের ব্যানারে রবীন্দ্রনাথের কাহিনি অবলম্বনে প্রথম ছবি করেন—'নৌকাডুবি'। ওই একই বছরে, একই বিষয় নিয়ে হিন্দি ভার্সানে পুনর্নির্মাণ করেন 'মিলন' নামে ছবিটি। যে ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দিলীপ কুমার, তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ছবি। প্রথম নবাগতরূপে তিনি চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন ঠিক বছর তিনেক আগে ১৯৪৪-এ অমিয় চক্রবর্তী নির্দেশিত 'জোয়ার ভাটা' ছবিতে।

পরের বছর ১৯৪৮ সালে নীতিনের 'দৃষ্টিদান' ছবি সম্পর্কে দর্শক বা চিত্র সমালোচকের মধ্যে তেমন কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়নি। তবে পরবর্তীকালে এই 'দৃষ্টিদান'ই এক বিশেষ কারণে ঐতিহাসিকভাবে মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সেটা হল বাংলার মহানায়ক উত্তমকুমারের প্রথম আবির্ভাব। নবাগত হিসেবে তিনি চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন, তিনি জীবিতকালেই কলকাতা ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রিতে নিজের অভিনয় ক্ষমতার জোরে মহানায়ক-এর শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জন করেছেন দর্শকদের কাছ থেকে। বলা যায়, বাংলা ছবির একচ্ছত্র প্রতিনিধিত্ব করে। একটা সময় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির তিনি 'আইকন' হয়ে উঠেছিলেন। তিনি একাই বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সচল রাখার পক্ষে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। ষাটের দশকে নীতিন বোস বোম্বে ফিল্মিস্তান স্টুডিয়োর ব্যানারে বেশ কিছু-সংখ্যক চলচ্চিত্র সৃষ্টি করেছেন। যেমন বিচার (১৯৪৩-বাংলা) 'পরায়া ধন' (হিন্দি), মুজরিম (১৯৪৪), মজদুর (১৯৪৫) এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গঙ্গাযমুনা (১৯৬২)—যে ছবি বিবেচিত হয় ভারতীয় সিনেমার

সর্বসময়ের ব্লকবাস্টার হিসেবে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে চূড়ান্ত আর্থিক লাভের ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম। নীতিনবাবু একসময় নিজে প্রোডাকশন কোম্পানি তৈরি করেন, এবং ১৯৫৩ সালে 'দর্দ-এ-দিল' ছবিটি তৈরি করে দর্শকদের উপহার দেন। এছাড়া পরিচালক অমিয় চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর, নীতিন 'কাঠপুতলী' ছবিটি শেষ করেন—আসামের গৌহাটি স্টুডিয়োতে।

১৯৩৭-এ নিউ থিয়েটার্সে থাকাকালীনই যে বাংলা ও হিন্দি ডবল ভার্সনে 'দিদি' ও 'বড়ি বহেন' করেন (যার বিকল্প নামাঙ্কিত হয় প্রেসিডেন্ট) তার প্রেক্ষাপট ছিল কাপড় তৈরি কারখানা ঘিরে। বুঝতে হবে ছবিটি প্রেমের আখ্যানে জারিত হলেও, গল্পের ভেতরেও মোড়ক বাঁধা ছিল বাস্তববাদী আর্থ-সামাজিক উপাদান। 'প্রেসিডেন্ট' রচিত হয়েছে টেক্সটাইল মিলের অন্তর্কলহ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক অন্তর্দ্বন্দের সমারোহে। এখানে একজন নারীর প্রেমের করুণ পরিণতি নাটকীয়ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। তিরিশ দশকের ভারতবর্ষে দ্রুত ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের নেতিবাচক ফলাফলের এক নজির তুলে ধরতে চেয়েছেন পরিচালক। পরিচালকের মনে হয়েছে ভালোবাসার দৃশ্যকে সাজাবার জন্য কখনো আঞ্চলিক রোমান্টিকতাকে বেছে নেওয়ার প্রয়োজন যেমন নেই, তেমনি তিনি কখনোই দেখাতে চাননি নায়ক-নায়িকা তাদের প্রেম-পর্বে গাছের শাখায় ঝুলে ঝুলে অথবা নির্বোধের মতো ঝড়ের ভেতর দৌড়ে দৌড়ে কোনো অবাধ্য আচরণ করুক—যা প্রায়শই হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে দেখা যায়। ভালোবাসা বা প্রেম তাঁর কাছে ছিল আন্তরিক সুগভীর চেতনা। ভাবগম্ভীর রসের ভেতর এক পেলবতার সম্পর্ক। যাকে গভীর মর্যাদাম্পন্নবোধে গ্রহণযোগ্য বলেই তিনি ভাবতেন। এই 'দিদি' কিংবা 'প্রেসিডেন্ট' ছায়াছবি ওঁর সমস্ত মার্জিত রুচিসম্পন্ন এবং সাংস্কৃতিক সম্পন্ন কাজগুলির মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচিত হয়। ছবির উল্লেখযোগ্য দিক হল, মূল কাহিনি কোনো প্রচলিত সাহিত্য কর্মের নির্যাস নয়। নিউ থিয়েটার্সেরও তৎকালীন রীতি ও কাজের প্রেরণা এমনই ছিল। তাই নীতিন নিজেও চিত্রনাট্য পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসের কাজে এম. এম. বেগ-এর তৈরি কল্পকাহিনির প্রতি ঋণী ছিলেন। তিনি সর্বদাই চলচ্চিত্র মাধ্যমে তার বিকাশ ঘটাতে চেষ্টা করেছেন সাহিত্যের সবরকম প্রভাব এবং বাগাড়ম্বরতাকে এড়িয়ে। যাতে চলচ্চিত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বশাসিত শিল্পরূপে গড়ে ওঠে। যেমন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—সাহিত্যের মতন চলচ্চিত্র শিল্প মাধ্যমেও যেন নিজস্ব কোনো একটা ভাষা গড়ে ওঠা প্রয়োজন—যাতে চলচ্চিত্রকে অন্য কোনো মাধ্যমের কাছে হাত পেতে ঋণী হতে না হয়। সেখানেই হবে পর স্বনির্ভরশীল স্বয়ংসম্পূর্ণতা। এই ছবির আগে কাউকে এভাবে ভাবতে কখনো দেখা যায়নি। 'প্রেসিডেন্ট'কে সমালোচকরা আবেগে ও উচ্ছ্বাসে হলিউড ছবির সাথে তুলনামূলক বিচার করতেও উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। কমলেশ কুমারী অভিনীত প্রভাবতী ষোলো বছরের একটি মেয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে

বিশাল বড়ো এক কাপড়ের কলের মালিক হয়। তার জেদ, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে কোম্পানিকে সে আরও বড়ো করে তোলে। শুধুই কি তাই, পুরুষশাসিত সমাজকে তোয়াক্কা না করে সে এক আশ্চর্য অপ্রতিরোধ্য শক্তির অধিকারী হতে পেরেছে। এই প্রতিষ্ঠিত মিলেই প্রকাশ নামে এক যুবক কাপড় ডিজাইনার নিযুক্ত ছিল, যার ভূমিকায় অভিনয় করেন কে. এল. সাইগল। সে যখন নির্ভীকভাবে নিজের পরিকল্পিত নকশার গুণগত উচ্চতার কথা বলতে গিয়ে বলেছিল সেকালের অচল, দুর্ঘটনাপ্রবণ যন্ত্র এবং অক্ষম মেশিনপত্রের কারণে যে-কোনো সময় শ্রমিক ও কর্মচারীরা দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে কিংবা কারখানাও আকস্মিক ক্ষতিকর ঘটনার কবলে পড়তে পারে, ঠিক তখনই মিলের মালিক প্রভাবতী প্রকাশকে বরখাস্ত করে। কেননা প্রভাবতীর কাছে মনে হয়েছে—বেতনভুক কর্মচারী হয়ে এটা নিছক সীমালঙ্ঘনের প্রচেষ্টা। এই অযাচিত উপদেশ শ্রমিক হিসেবে তার অনধিকারচর্চা। তাই নিজের সম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্ব রক্ষার খাতিরে, প্রকাশ দক্ষ ও যোগ্য কর্মী হলেও, তাকে বরখাস্ত করাটা সাধারণ নিয়মের মধ্যেই পড়ে। অথচ কারখানার সুরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার অভাব সত্যই রয়েছে। সেটার চেয়েও অহং সর্বস্ব ক্ষমতার গুরুত্বই বেশি পেয়েছে তার কাছে। এরপর প্রকাশ অন্য কোনো সংস্থায় চাকরির সন্ধানে বেরিয়ে হঠাৎই প্রেমে পড়ে এক লাস্যময়ী যুবতী নারীর যার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন লীলা দেশাই। সে যে আবার প্রভাবতীরই বোন, সে কথা তার তখন পুরোপুরি অজানা ছিল।

অজান্তেই প্রভাবতীর সুসময়ের থেকে দুঃসময়ের দিকে চাকা ঘুরতে শুরু করে। কাপড়ের কলের এক শ্রমিক যখন সেই পুরাতন মেশিনে মারাত্মকভাবে জখম হয়, ঠিক তখনই আবার প্রকাশের খোঁজ পড়ে। পুনরায় ওই কোম্পানিতেই তাকে বহাল করা হয়। যদিও ইতিমধ্যে বাজারে সর্বত্র প্রকাশের নকশা করা কাজের প্রশংসা ছড়িয়েছে, জনপ্রিয়তাও বেড়েছে। ডিজাইন ইউনিটের প্রধান পদ থেকে তাকে মিল-এর জেনারেল ম্যানেজার পদে উন্নীত করা হয়।

যে নারী মিল-এর বোর্ড মিটিং এবং মেশিন ছাড়া চিরকাল আর কিছুই জানত না, যেন অতর্কিতে তাঁর মধ্যে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেল—নিরাশার কোন ব্যর্থ প্রেমে। যখন তার কাছে উন্মোচন হল—জীবনে একমাত্র যে পুরুষ, যাকে বেপরোয়া আকাঙ্ক্ষায় মনে মনে প্রেম নিবেদন করেছিল, সেই মানুষই কি না তার বোনের প্রতি অনুরক্ত, ভালোবাসায় তাদের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। তখন তার মন, বেদনার অতল আঁধারে তলিয়ে যেতে বসেছে। যেন অদ্ভুত, বিপন্নবোধে বিস্মিত হয়েছে—দুজন নারী, তারা বোনও বটে, ভালোবাসছে একই পুরুষকে। এরকম ভাবনা চলচ্চিত্রে কোনো অভিনব বিষয় নয়। এমন অনেক দেখা গেছে। কিন্তু সবচেয়ে যেটা আকর্ষণীয়, তা হল ছবির চরিত্রগুলির উপস্থিতি ও তাদের সম্পর্কের টানাপোড়েনকে

পরিচালক যেভাবে গোটা কাহিনি বিন্যাস বিশ্বাসযোগ্যভাবে সাজিয়েছেন, সেটাই অসামান্য কীর্তি। সংলাপের গুরুত্ব মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। পরিচালক চরিত্রগুলিকে সাবেকি ধারণার রঙে ও মোড়কে উপস্থিত না করে, ধীরে ধীরে প্রতিদিনের বাস্তব ব্যবহারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গতানুগতিক যে ধারাবাহিক ভাবনা, তা ভেঙে অকস্মাৎ কোনো দৃশ্যকে বিস্ময়সূচক উপাদানে উপস্থিত করেছেন। প্রভাবতী চরিত্রটি কিছু কারণে কিন্তু জটিল। যে চরিত্রের মধ্যে রয়েছে গভীর আবেগ ও কামনায় জর্জরিত মন, তবু তা উন্মীলিত করতে পরে না সামাজিক ব্যক্তিত্ব রক্ষার কারণে। যার সমস্ত আচরণভঙ্গিতে এবং চাপা ভাবাবেগের ভেতর রয়েছে পূর্ণ এক ব্যাপ্তি। কখনো তার রয়েছে একগুঁয়ে স্বেচ্ছাচালিত মনোভাব, আবার ব্যক্তি স্বাধীনতার চেয়েও রয়েছে কর্তৃত্বপূর্ণ আদর্শকেই বেশি প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেওয়া। বিনম্র স্বভাবকে মুলধন করে নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক গঠনের পরিভাষাকে চায় আত্মগোপন করতে। প্রেমের ক্ষেত্রে আত্মজিজ্ঞাসায় সে রিক্ত, দীর্ণ। মানসিক দ্বন্দ্বে একদিকে বোনের প্রতি ভালোবাসা, আর অন্যদিকে উৎসর্গীকৃত প্রেমের একমাত্র পুরুষ (প্রকাশ)-এর প্রতি তীব্র আসক্তি—তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, তারই রচিত এবং তারই জারিত অনিয়ন্ত্রিত অশান্ত মনন। এ ছবির উপস্থাপনা সেকালে উচ্চদক্ষতা সম্পন্ন আঙ্গিকে গঠিত। পরবর্তীকালে এই ছায়াছবির বিষয় ও ভাবনাকে ভেঙেচুরে অনেক ছবি তৈরি হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তার মান কি কোথাও এই ছবি (দিদি/প্রেসিডেন্ট)-র সমকক্ষে পৌঁছোতে পেরেছে? কিংবা তাকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে? সে উত্তর দর্শকের অজানা নয় আশাকরি।

১৯৩৮ সালে নির্মিত 'ধরতী মাতা' ছবিটি ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা ও গ্রামীণ সভ্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই তৈরি। যার বিষয় বক্তব্য ছিল সমবায়ভিত্তিক, চাষাবাদ। সমষ্টিগতভাবে যৌথব্যবস্থায় কৃষিকার্যকরণ। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে পুরোপুরি এক নতুন সম্ভাবনাময় ভাবনা। ছবিটি তৈরির ক্ষেত্রে মৌলিক প্রেরণা ছিল—ত্রিশ দশকের সোভিয়েত রাশিয়ার আমূল পরিবর্তনের প্রভাব। ঐতিহাসিক পটভূমিকা থেকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে বিবেচনা করলে দেখা যায়—রাশিয়ার প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক আলেক্সজান্ডার দভজেস্কো রচিত ও নির্দেশিত—'আর্থ' ছবিটি তৈরি হয়েছিল ১৯৩০ সালে। চলচ্চিত্র ইতিহাসে আজও ছবিটিকে এক মাইলস্টোন বলে মনে করা হয়। সমবেত প্রচেষ্টায় কৃষিকর্ম সংক্রান্ত এবং চাষাবাদের এক মহিমান্বিত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিগ্‌দর্শন। নীতিন বোস সেই সূত্রেই খানিকটা প্রভাবিত হয়ে বাংলা ও হিন্দি ভবল ভার্সানে 'দেশের মাটি' ও 'ধরতী মাতা' ছবি দুটি সৃষ্টি করেন। গোটা উপস্থাপনায় মেলোড্রামার স্পষ্ট প্রকাশের মাধ্যমে পরিচালক নিজস্ব কৌশলকে ব্যবহার করে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

কাহিনি এবং চরিত্রের বিন্যাসে পরিচালক সমেত প্রায় ছয়জন মিলে চিত্রনাট্য তৈরির কাজে যুক্ত ছিল। এই চলচ্চিত্রের প্রোটাগোনিস্ট চরিত্র অশোক (কে. এল.

সায়গল) ছিল একজন আদর্শবাদী যুবক। যে বিশ্বাস করত ভারতবর্ষের চাষিদের কিংবা কৃষক সমাজের দুঃখ-কষ্ট দুর্দশা মোচন করার একমাত্র পথ হল সমবায়ভিত্তিক চাষ-আবাদ এবং উন্নতমানের কৃষি ব্যবস্থাকে 'গ্রহণযোগ্যতা'র সঙ্গে কাজে লাগানো। যৌথ উদ্যোগ ছাড়া খামার বিকাশ করা অসম্ভব। অশোক নিজের আদর্শ মতোই জীবনসঙ্গিনী হিসেবে নির্বাচন করে তারই এক বড়োলোক শহুরে শিক্ষিত বন্ধুর বোন প্রতিভাকে (কমলেশ কুমারী), যার সঙ্গে আদর্শগত সব ভাবনাচিন্তা বোঝাপড়া, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং কর্মপদ্ধতির কথা সে ভাগ করে নিতে পারে। প্রতিভাও যথার্থ অর্থেই তার ভালোবাসা নিবেদন করে। কিন্তু জীবন তো আর সরল অঙ্কের রূপরেখায় সমাধানের পথে এগোয় না। নানান ঘটনার পরম্পরায় দেখা যায়, প্রতিভা সঙ্গীরূপে অশোকের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলেও, কৃষকদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে উমাশশী নামে এক স্থানীয় যুবতীর প্রতি অশোক নতুনভাবে আকৃষ্ট হয়। তাতে মানসিকভাবে প্রতিভা এতটাই কঠিন আঘাত পায় যে, সে নিমেষে আত্মমর্যাদার সাথে গুটিয়ে নেয়।

এরপর শুরু হয় অশোকের সঙ্গে জমিদার এবং তার অনুগত বশংবদ কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীদের আদর্শগত সংঘাত। তারা শোষণ বঞ্চনার প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রেখে হুমকি চালায়, আর অন্যদিকে অশোক সচেষ্ট হয় কৃষকশ্রেণিকে শোষণের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে কীভাবে স্বনির্ভরশীল করা যায়। জমিদারশ্রেণির সশস্ত্র বাহিনী উঠে পড়ে লেগে থাকে, তার প্রচেষ্টাকে বানচাল করতে। এখানেই নীতিন নির্দেশকরূপে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, আদর্শগত দ্বন্দ্বের সঙ্গে, আবেগতাড়িত টানাপোড়েনকে কৌশলগত বুননের কাজে সমৃদ্ধ করে সফল হয়েছেন। অথচ সেখানে কোনো পাণ্ডিত্য অথবা তাত্ত্বিকতা কিংবা অযথা আবেগপূর্ণ উক্তিতে বাজিমাত করার কোনো চেষ্টা ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আপাদমস্তক ছবির কাঠামোয় সমাজতন্ত্রের একটা ঝোঁক রয়েছে ঠিকই কিন্তু নির্দেশক ধনিকশ্রেণিকে কখনোই তীব্র নিন্দা বা কঠোর ভর্ৎসনায় বিদ্ধ করেন নি। শুধুমাত্র শ্রেণিসংগ্রাম বা শ্রেণিদ্বন্দ্বকে প্রত্যক্ষ উচ্চারণে ব্যক্ত না করেও আভাসে ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন একই কথা, আর শ্রেণিবৈষম্যকে তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করেছেন। শহরে জন্মানো ও বেড়ে ওঠা শিক্ষিত ধনী পরিবারের মেয়ে সম্পর্কে সচরাচর যে ধারণা সাধারণের কাছে উপলব্ধ হয়, পরিচালক প্রতিভাকে ঠিক সেভাবে বোঝাতে চাননি। সে শিক্ষিতই শুধু নয়, অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন সামাজিক দায়বদ্ধ এক নারী। এটাই প্রতিভার এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গুণও বলা যেতে পারে। ধনী পরিবারের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও, উগ্র-আধুনিকতার বিপক্ষে যে হাঁটতে পারে, হঠকারী অহংবোধহীন এক সহনশীল নারীর উদাহরণ। তাঁরই ছাত্র এবং প্রসিদ্ধ ক্যামেরাম্যান তথা চিত্রপরিচালক বিমল রায় যে ১৯৪৪ সালে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন 'উদয়ের পথে' সেটারই পূর্বাভাস 'ধরতী মাতা' ও 'দেশের মাটি'।

উপরিউক্ত আলোচ্য ছবির আগেই ওই বছর (১৯৩৮) নীতিন বোস বাংলা ও হিন্দি ডবল ভার্সানে তৈরি করেন যথাক্রমে 'জীবন মরণ' ও 'দুষ্মন' ছবি। এই ছায়াছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিচালককে একটা ধারণা দিয়েছিলেন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো, যিনি ছিলেন সম্রাট জর্জের টিউবারকিউলোসিস ফান্ডের চেয়ারম্যান। তিনি মনে করতেন যে যদি সাংঘাতিক কোনো রোগের প্রকোপ ঠিকমতো দেখানো যায়, তবে প্রচারমূলকভাবে সে ছবি দর্শকগণের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হতে পারে, তাতে আর্থিক আনুকূল্যও মন্দ হবে না। যেন রথ দেখতে কলা বেচা—এক কাজে দুই কাজই হবে। বাজারে ছবি চললে, ব্যয়িত অর্থ যেমন সহজে উঠে আসবে, তেমনি সাধারণ দর্শকবিশেষ রোগ সম্পর্কেও সচেতন হবে। তার ফলে জ্ঞানও বাড়বে এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য সচেষ্টও হবে। তবে নীতিন জানতেন, প্রচারমূলক হলেও একটা ভালো ছবি দর্শকদের শুধু আনন্দ দিয়েই পরিতৃপ্তি করে না, মানুষ হিসেবে দর্শকের হৃদয়বৃত্তিকেও আবেগধারা স্পর্শ করে। 'জীবন মরণ' বা 'দুষ্মন' ছবির প্লট অত্যন্ত সাদামাটা পরিচিত কাহিনি। নিদের্শক নিজস্ব মুনশিয়ানায় ছবিতে গভীর অনুভবকে ব্যক্ত করতে পুরোপুরি সফল হয়েছেন। করুণ মানবিক দুঃখ বেদনাকে তুলে ধরতে পেরেছেন উঁচু পর্দার আবেদনে। এই কারণেই তাঁর ছবিগুলি দশকের সমঝদারিতে বিশেষ মাত্রায় গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

ছায়াছবির ঘটনা আবর্তিত হয়েছে দুই বন্ধুর মধ্যে। যথাক্রমে কে. এল. সায়গল ও নাজমুল হোসেন অভিনীত দুটি চরিত্র। এঁরা দুজনেই একই নারীর প্রতি প্রেমাসক্ত, তাঁদের ভালোবাসার লক্ষ্য যে নারীর প্রতি, তার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সে যুগের প্রখ্যাত অভিনেত্রী লীলা দেশাই। দুই বন্ধুর প্রেম বিরহ ভালোবাসার যে অনিশ্চিত উত্থান-পতন—সেটাই ছবির শেষ পর্যায়ে এসে প্রকাশ হয়, এক বন্ধুর আত্মত্যাগের মাধ্যমে। অভিনেতা নাজমুল হোসেনকে আগে বোম্বে টকিজের 'জওয়ানী কী হাওয়া' এবং নিউ থিয়েটার্সের 'অনাথ আশ্রম' ছবিগুলিতে দেখা গেছে। সে ছিল মূলত একজন হ্যান্ডসাম ডেমি। পরবর্তীকালে—প্রত্যক্ষ অভিনয়ের সুযোগ পাওয়াতে নিজের চাপা প্রতিভাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে। আর লীলা দেশাই সম্পর্কে এক সময় 'বোম্বে ক্রনিকল'-এর সমালোচক লিখেছেন—'নীতিন বোসের মতো একজন প্রতিভাবানের প্রয়োজন ছিল একজন নায়িকার।' তাই তিনি তাঁকে অপেশাদারি থেকে পুরোপুরি নিয়ে আসেন পেশাগত জীবনে। লীলা দেশাইকে এক সবল যৌবনোদ্ধত অনন্য সৌন্দর্যের আধারে এনে, ভুল উচ্চারণ সত্ত্বেও তার উত্তরণ ঘটান। যার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব নীতির বোসের। তিনি তাঁর নিজস্ব ধারায় পরিবর্তন করেছেন অপ্রত্যাশিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। সায়গল অভিনয় করেছিলেন বিপন্ন প্রেমিক চরিত্রে। এক্ষেত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে, একজন বিচক্ষণ নির্দেশক বোঝা যায়—বিষয় সম্পর্কে তার আন্তরিকতা ও সহানুভূতি রয়েছে। চরিত্রের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন ভয়কে জয় করা উদ্যম

ও আগ্রহই কীরূপে প্রকাশ করা যায়।

চলচ্চিত্র ইতিহাসে, এ-ও এক মূল্যবান স্মৃতি যে ১৯৪৬ সালে বোম্বে টকিজ প্রযোজিত এবং নীতিন বোস পরিচালিত 'মিলন' ছবিতে আজকের সুবিখ্যাত অভিনেতা দিলীপকুমার তাঁর নিজের প্রতিভার চূড়ান্ত সাফল্যে প্রথম সম্মানিত হয়েছেন। তাঁর অভিনয়শৈলী আজও এক বিস্ময়কর নিদর্শন হয়ে আছে। এবং একালেও বলা যায় তা অনুকরণযোগ্য।

নীতিনের নিখুঁত কারিগরি কর্ম ও নান্দনিক ভাবনা যুক্ত হয়েছিল রোমান্টিক মানবতাকে ঘিরে। যার ফলে তৎকালীন আদর্শগত বাস্তববোধ এবং দায়বদ্ধ নিষ্ঠায় পুনঃপুনঃ বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে সৃষ্টি হয়েছে তাঁর ছায়াছবিগুলি। সেই কারণেই তাঁর নিজস্বতায় তিনি চলচ্চিত্রে বিশেষ একটা স্থান স্বগর্বে অধিকার অর্জনে সেদিন সক্ষম হয়েছিলেন। এই বিরল প্রাপ্তি সেকালের খুব কম চিত্র নির্দেশকের ভাগ্যেই জুটেছে।

একটা সময় তিনি নিউ থিয়েটার্সের স্টুডিয়োর সঙ্গে যখন ভীষণভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, সে সময় ১৯৪১ সালে 'লগন' ছবিতে কে. এল. সায়গল ও কানন দেবীকে যথার্থভাবে কাজে লাগিয়েছেন। পরে ১৯৪৩ সালে বাংলার মহান কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কাশীনাথ' কাহিনির ভিত্তিতে নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে শেষ ছবি পরিচালনা করেন। শেষের এই দুটো ছবিই জনপ্রিয়তার নিরিখে চিহ্নিত হতে পেরেছে।

চল্লিশ দশকের গোড়া থেকেই সময়টা ছিল এমন ঐতিহাসিকভাবে ভয়াবহ—গোটা পৃথিবীতে সমস্ত দেশে দেশে শুরু হয়েছে বিশ্বযুদ্ধের কলরোল—ভয়ঙ্কর গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে শোনা যাচ্ছে শত্রু-মিত্র পরস্পরের দামামা। সামাজিক অবক্ষয় থেকে শুরু হয়েছিল আর্থিক অনটন ও অবক্ষয়। প্রতিটি মানুষের জীবন ও জীবিকার ছন্দ যেন অতর্কিতে পালটে গিয়েছিল। এই অবনতির সূত্রপাত ছিল ১৯৩৯ সাল। সেই অমানবিক দ্বন্দ্বের তীব্র প্রভাব ভারতের মাটিতেও ছিল অব্যাহত। তাই কলকাতাই বা সেই আঁচ থেকে মুক্তি পাবে কীভাবে! দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল সকল পেশা ও সব সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ জীবন। রেহাই ছিল না কারো পক্ষে শান্তির বাতাবরণে নিজেকে নিরাপদ আশ্রয়ে সুরক্ষা করার। একদিকে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের অভাব-অনটন আর অন্যদিকে আকাশচুম্বী মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি এবং কর্মসংস্থানের তীব্র অভাব। কোনো কাজের স্থায়ী নিরাপত্তাও ছিল তখন আকাশকুসুম ভাবনা। সকলেই আজ জানে বিশ্বযুদ্ধে জাপানি বোমার থেকে রক্ষা পায়নি কলকাতা। এমতাবস্থায় যুদ্ধে বিধ্বস্ত হবার ফলে কলকাতার নাগরিক অবস্থান এবং জীবনযাপনের ন্যূনতম শর্ত স্বীকৃতির কোনো লক্ষণ ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্য কলকারখানা ও শিল্প উৎপাদন সবই অধোগতিতে ছিল ধাবিত। তাই চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রেও তখন কে সাহস করে টাকা লগ্নি কে করবে! বাংলা ছবির বাজার তখন ছিল খুবই স্বল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ।

পশ্চিমবাংলা এবং পূর্ববাংলা ছাড়া আর কোনোভাবে কোনো দর্শক ছিল না। আর সেকালে সাবটাইটেলের প্রচলনও কিছু হয়নি। আজ পৃথিবীর যে-কোনো ভাষার ছবি শুধুমাত্র সাবটাইটেলের ভরসাতেই পৃথিবীর যে-কোনো ভাষাভাষী দেশে, রাজ্যে, এবং এমনকি সুদূরতম অঞ্চলেও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বাধা হয় না, বরং সাবটাইটেল যুক্ত ছায়াছবির মাধ্যমেই দর্শকদের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করে। এর মাধ্যমে চলচ্চিত্রের বাজার অর্থনীতির একটা সুরাহা যেমন সম্ভব, তেমনি প্রযোজনার বিনিয়োগীকৃত আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ ফিরে পেতে ও লাভের মুখ দেখার ক্ষেত্রেও এটি একটি বিকল্প সুযোগও বটে। কিন্তু সে সময় আঞ্চলিক ভাষার এটাই ছিল এক মস্ত প্রতিবন্ধকতা। মুষ্টিমেয় মানুষই ছিল তার একমাত্র দর্শক। যাই হোক, দেশময় কর্মক্ষেত্রে সেই বিভীষিকার দরুন বহুসংখ্যক শিল্পী, কলাকুশলী কলকাতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল এবং তাঁদের সকলকে আশা জাগিয়েছিল ও প্রভাবিত করেছিল বোম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। সে কারণেই অনেকে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে বোম্বে পাড়ি দিয়েছিল। বোম্বে ছিল ভারতবর্ষে চলচ্চিত্রর পীঠস্থান—যার গোড়াপত্তন করেছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম চলচ্চিত্র স্রষ্টা দাদাসাহেব ফালকে। যে কারণে ভারতবর্ষের সমস্ত আঞ্চলিক (রাজ্যের) শিল্পী কলাকুশলী সহ সঙ্গীত রচয়িতা, গীতিকার এমনকি বহু সাহিত্যিকও সেদিন জড়ো হয়েছিল তৎকালীন ফিল্মি দুনিয়াতে। বোম্বে মানেই ফিল্ম মার্কেট। শুধুমাত্র চলচ্চিত্র শিল্পের প্রভাবে ও দৌলতে ফুলে-ফেঁপে ওঠা একটা শহরের আকর্ষণ জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তাছাড়া, অবাধে কাজের সুযোগ ও চাহিদার কারণে সকলেরই আশা ছিল, উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে না। নীতিন বোসও সেই ভাবনার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তবে কলকাতা ছাড়া এবং বোম্বে যাওয়ার ব্যাপারে নীতিনের ক্ষেত্রে অন্য আরেকটি কারণ ছিল। 'কাশীনাথ' ছবি তৈরির পরেই নীতিনের সঙ্গে নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার বি. এন. সরকারের বিশেষ কোনো বিষয়ে মতবিরোধ ও মনোমালিন্যের ফলে ছবিটি শেষ করার পর তিনি মুখ ফিরিয়ে বোম্বে চলে যান। এ বিষয়ে, প্রকৃতি ঘটনা সম্পর্কে তেমনভাবে কেউই স্পষ্টভাবে কিছু ব্যক্ত করেন নি কখনো। তবে জীবন সায়াহ্নে তাঁর গভীর অনুশোচনা নিজেই প্রকাশ করেছিলেন। আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'এ আমার জীবনের এক মস্ত ভুল।' এই অনুতাপের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে সকলেই অজ্ঞাত।

নিউ থিয়েটার্সে থাকাকালীন ১৯৪১ সালে 'পরিচয়' নামে বাংলা ছবির সঙ্গে স্বল্পবিন্যাসে হিন্দি ভাষায় যে রিমেক করেন 'লগন' ছবিটি, তার চিত্রগ্রাহক হিসেবে নিজেই ছিলেন সেই দায়িত্বে। তাঁর ভাই মুকুল বোস সেখানে সাউন্ড রেকর্ডিং-এর দায়িত্বে ছিলেন। ছবির সম্পাদনার কাজ করেন সুবোধ গাঙ্গুলি। শিল্প-নির্দেশক ছিলেন সৌরেন সেন। সঙ্গীত পরিচালনার ভার ছিল সেকালের প্রখ্যাত সঙ্গীতকার রাইচাঁদ বড়ালের ওপর। ছবির মূল চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেন কে. এল. সায়গল ও কানন

দেবী। অনেকের কাছে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়, প্রবাদপ্রতিম এই দুই শিল্পী অভিনয় ছাড়াও সুগায়ক হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আর এটাও মনে রাখা প্রয়োজন, তাঁরা শুধু জনপ্রিয়ই ছিলেন না, সেকালে খ্যাতির শীর্ষেও ছিলেন। যেমন একসময় বোম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অভিনয়ে ও গায়কীতে দর্শক সমাজকে মাতিয়ে রেখেছিলেন চিরঅম্লান শিল্পী সুরাইয়া, নূরজাহান, তালাত মেহমুদ এবং অবশ্যই অদ্বিতীয় কিশোর কুমার। এছাড়াও আরও কিছু অসামান্য স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম হল কৃষ্ণচন্দ্র দে যিনি ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে মান্না দের আপন কাকা। নিউ থিয়েটার্সের প্রথম দিন থেকেই কাজ করে এসেছেন, বলা যায় এক প্রকার নীতিন বোসেরই আবিষ্কার এই অন্ধ অভিনেতা ও গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে। বাংলা ও হিন্দি ছবিতে ছিলেন সমান দক্ষ।

'লগন'-এ মোট আটটা গানের মধ্যে চারটে কানন দেবী এবং চারটে কুন্দনলাল সায়গল গেয়েছেন আবেগ দিয়ে। 'লগন'-এর পর ১৯৪৩-এ 'কাশীনাথ' শেষ করেই নীতিন বোম্বে পাড়ি দেন। সেখানে গোড়ার দিকে যেসব ছায়াছবি করেছেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৪৬-এ 'নৌকাডুবি' বাংলা, হিন্দিতে রিমেক 'মিলন'। ১৯৫০-এ 'সমর' (বাংলা) রিমেক 'মশাল' (হিন্দি), ১৯৫০-এ 'দিদার' (হিন্দি) এবং ১৯৬১-তে 'গঙ্গা যমুনা' (হিন্দি)—যে ছবি রিলিজ হওয়ামাত্রই নীতিন বোসকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায়, সেটা ওই সময় চলচ্চিত্র ইতিহাসে যেমন এক বিরল ঘটনা, তেমনি নির্দেশকরূপেও এক তুঙ্গ বিন্দুতে তিনি পৌঁছোন বলেই অনেকে মনে করেন। কেননা এরপর পরবর্তী জীবনে তিনি যা কিছু ছবি করেছেন, সেসব বাজার অর্থনীতির দিক থেকে কিছু সফল হলেও, দর্শকের মনোরঞ্জনে তেমন সমর্থ হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'নৌকাডুবি' গল্পটি ১৯৪৬ ফলে বোম্বে টকিজ স্টুডিয়োতে বাংলা ও হিন্দি দুটি ভার্সনেই তৈরি করেছেন নীতিন, যথাক্রমে 'নৌকাডুবি' ও 'মিলন' নামে। বাংলা ছাড়াও ছবিটি হিন্দি ভাষায় তৈরি করার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর মূল ভাবনা ছিল—বৃহৎ সংখ্যক অবাঙালি ভারতীয়দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে আরও বেশি করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তেত্রিশ বছর (১৯১৩) আগে যে ভারতীয় কবি প্রথম নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, তাঁর অজস্র সৃষ্টিসম্ভারের স্বাদ কতটুকুই-বা পেয়েছেন ভারতবাসী।

ছবির মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন দিলীপকুমার, মীরা মিশ্র, পাহাড়ী সান্যাল, মণি চ্যাটার্জি, শ্যাম লাহা, রঞ্জনা, এম নজির প্রমুখ অভিনেতা। বাংলা ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন অভি ভট্টাচার্য। আবজু লক্ষ্ণৌয়াভী ও পিয়ালী লাল সন্তোষীর গীত রচনা ভিত্তি করে সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার অনিল বিশ্বাস শ্রুতিমধুর সুরে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। এই চলচ্চিত্রের আরেকটি বিশেষ আকর্ষণীয় দিক হল রাধু কর্মকারের অনবদ্য ফোটোগ্রাফি।

নীতিন নিজেও একজন উচ্চমানের ক্যামেরাম্যান হওয়া সত্ত্বেও, যখন থেকে পরিচালনার কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন, বলতে গেলে সেই তখন থেকেই তিনি প্রত্যক্ষভাবে চিত্রগ্রাহক হিসেবে নিজেকে আর সেভাবে যুক্ত রাখেন নি। 'মিলন' সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে, আর্থিক সাফল্যের দিশা না পেলেও নির্দেশনার দিক থেকে শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে অনেকটাই সফল হয়েছিল। এ কথাও অনস্বীকার্য, রাধু কর্মকারের মতন একজন যথার্থ গুণী আলোকচিত্রীর সান্নিধ্যে কাজ করার সুযোগে—নান্দনিকভাবে অবশ্যই ছবির গুণগত মান বেড়েছিল। কেননা, রাধুবাবুর সৃজনী প্রতিভা ও দক্ষতা কাজের ভেতর সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষত রাত্রির দৃশ্যের দীপ্তমান শটগুলিতে। তাঁর সেইসব কাজ দেখার পর, ছিদ্রান্বেষী চলচিত্র সমালোচকরাও শেষপর্যন্ত উচ্চস্বরে প্রশংসা ও সংবর্ধনা জানাতে বাধ্য হয়েছিল। নানান শব্দ, ধ্বনি এবং অন্যান্য অডিয়ো রেকর্ডিং-এর সব কাজই করেছেন সাউন্ড রেকর্ডিস্ট মুকুল বোস।

আলোকচিত্র শিল্পী ও চিত্র-পরিচালক নীতিন বোস প্রাক্-অবসর জীবন যাপনের আগে কখনোই সৃষ্টির কাজের গতিকে রুদ্ধ করেন নি। একের-পর-এক অথবা কখনো একসঙ্গে দুটো ছবির ভাবনায় কাজে এগিয়েছিলেন, যা তাঁর চিত্রপঞ্জী নজর করলেই উপলব্ধি হয়। ১৯৫০ সালে আবার বাংলা ও হিন্দি দুই ভাষায় তৈরি করলেন 'সমর' (বাংলা) ও 'মশাল' (হিন্দি)। মালাড-এর বোম্বে টকিজ স্টুডিয়োতেই ছবিগুলির কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। প্রযোজক ছিলেন অশোককুমার ও সাভাক ভাচা। অভিনয়ে অংশীদার ছিলেন স্বয়ং অশোককুমার, সুমিত্রা দেবী, কানু রায়, অরুণ কুমার, নীলম কোঠারী, এস নাজির, কুক্কু, শিবরাজ, নানা পালশিকর, সতীদেবী, কৃষ্ণা কড়ির, রুমা দেবী (পরবর্তীকালে যিনি কিশোর কুমারের প্রথম স্ত্রীরূপে পরিচিত হন, এবং তারও পরে রুমা গুহঠাকুরতা নামে বিখ্যাত হয়েছেন)। এছাড়াও ছিলেন বিজয়া দাস (যাঁর পরিচয় পরবর্তীকালে সকলেরই জানা—বিশ্ববিখ্যাত চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের জীবনসঙ্গিনী বিজয়া রায় হিসেবে, তিনি নিজেও সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বেশ কিছু বেসিক ডিস্কও সেকালে খুব জনপ্রিয় ছিল, সারা জীবনে মোট গোটা চারেক ছবিতে অভিনয় করেছেন।) বলা বাহুল্য, তিনিও ছিলেন শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে নীতিন বোসের আত্মীয়া। তাঁর লেখা 'আমাদের কথা' বই-এ এক জায়গায় বলছেন—'আমাদের বাড়ির খুব কাছেই নীতিন বসু থাকতেন। ভারী সুন্দর বাড়ি ছিল ওঁদের, বান্দ্রার সমুদ্রের ধারে। আমরা প্রায়ই ওঁদের বাড়ি যেতাম। বোম্বে এলে মানিকও যেতেন।

'ওঁদের বাড়িতে ১৬ মিলিমিটারে ছবি দেখানো হত—ওঁরই তোলা সব ছবি। আমার খুব ইচ্ছে ছিল ওঁর ছবিতে কাজ করবার। তখন ওঁর খুব নামডাক। কিন্তু কোনোমতেই লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারিনি। বম্বেতে এত সব সুন্দরী অভিনেত্রী। তাঁদের সঙ্গে আমি পেরে উঠি কী করে। 'নৌকাডুবি'তেও আমি একটা কাজ পাবার

চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু হয়নি।' এরপরই বিজয়া রায় জানাচ্ছেন, 'নীতিন বোসের ''রজনী''তে একটা পার্শ্ব-চরিত্রে উনি আমাকে নিয়েছিলেন। বাংলা হিন্দি দু-ভাষাতেই হচ্ছিল। টাকার জন্য মরিয়া হয়ে চরিত্রটি গ্রহণ করেছিলাম। 'রজনী'র ভূমিকায় করেছিল আমাদের ছোটো রুমা, ওর বয়স তখন বারো-তেরো বছর। বড়দি রুমার মা সেজেছিলেন। প্রায় পারিবারিক ছবি বলা যেতে পারে। পরিবেশটাও অতি চমৎকার।' অন্য একজায়গায় লিখতেন—'তখন ''রজনী'' ছাড়া আর কোনো ছবিতে আমি কাজ করছিলাম না। কিছুটা কাজ তখনও বাকী ছিল। নীতিন বোস বললেন, আমার কাজটা উনি পিছিয়ে দেবেন। তবে পরে ফিরে এসে কাজটা শেষ করে যেতে হবে। তাতে আপত্তির কোনো কারণ ছিল না।'

এবার শোনা যাক, সেই বিখ্যাত 'সমর' ছবি সম্পর্কে তাঁর কি মতামত।

'নীতিন বসুর ''সমর'' কলকাতায় মুক্তি পেয়েছে। সেটা দেখতে যাবার জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হল। মানিকের খুব উৎসাহ দেখলাম না। কারণ তো আমি জানি। ওঁর স্ত্রীকে নিয়ে লোকে আলোচনা করুক, এটা ওঁর একেবারেই পছন্দ নয়। আমি ওঁকে অনেক বুঝিয়ে বললাম, আমার ভূমিকাটা এতই ছোটো যে, লোকেদের চোখেই পড়বে না, আলোচনা তো দূরের কথা। উনি কিন্তু কিছুতেই যেতে রাজি হলেন না। শেষকালে আমরা সবাই সদলবলে দেখতে পেলাম ওঁকে ছাড়াই। 'চম্পা'র চরিত্রের সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই। সে দজ্জাল ও ঝগড়াটি। আর আমি নম্র ও লাজুক। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার ছিল যে, মাইকের সামনে গাইতে গেলে যেমন গলা বুজে আসত, ক্যামেরার সামনে অ্যাকটিং করতে আমার কোনো লজ্জা ছিল না। পরিচালক যেমনভাবে নির্দেশ দিতেন, ঠিক সেইভাবেই করতাম। ভয় তো পেতামই না, বরং বেশ উপভোগ করতাম।

'নীতিন বসু আমার অভিনয় দেখে খুশি হয়েছিলেন। এইটুকু বলতে পারি। সবাই আমার খুব প্রশংসা করল মানিকের কাছে এসে। উনি আমার দিকে চোখ তুলে চাইলেন, পরে নিভৃতে চললেন, 'এই যে তুমি বলেছিলে, তোমাকে নিয়ে কোনো আলোচনা হবে না, আজ তো ঠিক তার উলটো হল।' আমি বললাম, 'এটা আমাদের বাড়ি বলে। অন্যসব বাড়িতে অশোককুমার, সুমিত্রা দেবী আর রত্নাকে নিয়ে লোকে হইচই করবে, চম্পার এই ছোটো কাজ, কে মনে রাখবে বল? সমর ভালোই চলেছিল, এবং যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিল।' তবে বিজয়া রায়ের কথার সূত্রেই মনে হল এ বিষয়ে একটা আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক দিক রয়েছে যা উপেক্ষণীয় নয়। তা হল, যে ছবি সত্যজিৎ রায় সিনেমা হলে গিয়ে দেখতে অনীহা প্রকাশ করেছেন, সেই পরিচালকের সেই ছবির শুটিং পর্বে অবজার্ভার হিসেবে আগ্রহান্বিত হয়ে উপস্থিত থেকেছেন। সেই কথাই সত্যজিৎ-এর অন্তিম যাত্রার পর 'মশাল' ছবির নায়ক অশোককুমার জানিয়ে দেন। ১৯৪০ সাল, বম্বে মালাডে তখন বোম্বে টকিজের দুরন্ত রমরমা। অশোককুমারের বয়স চল্লিশ। নায়কের বাজারে প্রায় একচ্ছত্র সম্রাট। হিন্দি

'মশাল' (বাংলা 'রজনী') ছবির শুটিং চলছে। সংলাপ বলতে বলতে অশোককুমারের চোখ চলে গেল স্টুডিয়োর গেটে—একেবারে কোণের দিকে। সংস্থার কলাকুশলী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট লোকেদের থেকে আলাদা হয়ে কে যেন বসে আছে। আধো-অন্ধকারে। চুপচাপ। যদিও মানুষটি কাউকে বিরক্ত করছে না। তবু নায়কের কেমন অস্বস্তি লাগল, শটটা জমল না। পরিচালক নীতিন বোসকে সামান্য তফাতে ডেকে নিয়ে অশোককুমার জিজ্ঞাসা করলেন—'ওই কোণে বসে ছেলেটি কে? কি করছে ওখানে বসে?' নীতিন বোস ওদিকে দেখে নিয়ে হেসে বললেন,—'ও কি তোমায় বিরক্ত করছে।' অশোককুমার—'উহুঁ! তা ঠিক নয়। তবে দলছুট হয়ে কোণে বসে রয়েছে বলেই নজর পড়ছে।' নীতিন বোস বললেন—'ও সম্পর্কে আমার বোন-পো (আসলে ভাই-পো), কাজ শিখতে চায়। শুটিং চলছে। নোট-টোট নিচ্ছে বোধ হয়।' অশোককুমারের কৌতুহলী প্রশ্ন—'কি নাম যুবকের?', নীতিন বলেন—'মানিক। ওঁর বাবাকে তো তুমি চেনো। সুকুমার রায়।'

এ প্রসঙ্গেই অন্য আরেকটি তথ্য উল্লেখ করতে চাই—তা হল নীতিন বোস স্মরণ করেছিলেন আরেকটু অতীত কথা—'সেটা খুব সম্ভবত ১৯৪৫ সালের শেষ আর নয়তো ১৯৪৬-এর শুরু। ওঁকে (সত্যজিৎ রায়) কোনো কারণে বোম্বে যেতে হয়েছিল। আমার সঙ্গেই ছিল। আমি তখন ডাবল ভার্সানে (বাংলা ও হিন্দি) রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে ''নৌকাডুবি'' আর ''মিলন'' ছবি তৈরি করছি। মানিক প্রায় রোজই সেট-এ আসত। আমি যেভাবে কম্পোজ করতাম ও ঠিক সেইভাবেই বুঝতে পারত। কীভাবে ছবি হবে। একটা শট-এর পর, নেক্সট শটটা কী হবে, কীভাবে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আসবে অর্থাৎ হোল কম্পোজিশনটা ও বলে দিত—আমার ছবি টেকিং-এর আগেই। আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম ও যদি ছবি তৈরির দিকে আসে তো ভীষণ উন্নতি করবে।'

একটা সময় নীতিন বোস ক্যামেরা বিভাগের দায়িত্বে থাকার সুবাদে, তিনি কিছু গুণী ছাত্রকে তৈরি করেছিলেন, যেকথা আগে বলা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বিমল রায়কে নিজের সহকর্মীর মর্যাদা দিয়ে একসঙ্গে কাজও করেন। তবে এই 'মশাল'-এ ক্যামেরার বদলে সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে সফল হয়েছিলেন বিমল রায়। এবং ফোটোগ্রাফির কাজে পুনরায় রাধু কর্মকারই দায়িত্ব পালন করেন। ছবির টাইটেল কার্ডে যদিও নাম লেখা ছিল—রাধিকা কর্মকার। এই রাধু কর্মকার সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন। একজন বাঙালি অলোকচিত্রশিল্পী কীভাবে কঠিন পরিশ্রমে ও কাজের নিষ্ঠায় বোম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ধাপে ধাপে শুধু উন্নতিও নয়—গোটা ভারতবর্ষে সুনাম অর্জন করেছিলেন, সে জন্য বাঙালি হিসেবে অবশ্যই আমাদের গর্ববোধ করা উচিত। তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সংশয়ের যথেষ্ট রয়েছে। রাধু কর্মকারের জন্ম ১৯১৯ সালে তৎকালীন পূর্ব বাংলা—ঢাকায়। পারিবারিক পেশা ছিল স্বর্ণকার। ১৯৩৬ সালে চলচ্চিত্র জগতে কর্মজীবন শুরু করেন কলকাতার ফিল্ম ল্যাবরেটরি

অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। ১৯৪৬-এ প্রথম সুযোগ আসে ফোটোগ্রাফার হয়ে 'কিসমত কা দান'-এ কাজ করার। এরপর তাঁর ভাগ্য ফেরে, বোম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে, বিশেষত বোম্বে টকিজের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য দিলীপ দত্তই প্রস্তাব দেন। তারপর সেখানে প্রবেশ করার পর সবটাই তো ইতিহাস হয়ে আছে। প্রথমেই ১৯৪৪-এ অমিয় চক্রবর্তীর নির্দেশনায় 'জোয়ার ভাঁটা'তে সিনেমাটোগ্রাফি করেন। পাঠকের অবগতির জন্য জানাই—এই ছবি রাধুবাবুর যেমন প্রথম ছবি, দিলীপকুমারেরও এখানে নবাগত নায়করূপে প্রথম আবির্ভাব। শুরু থেকেই তিনি নীতিন বোসের স্নেহধন্য ছিলেন। বহু ব্যাপারেই উৎসাহ দিতেন এবং কাজের প্রেরণা যুগিয়েছেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে নীতিন বোসের ডবল ভার্সান মোট চারটে ছায়াছবিতে রাধু কর্মকার আলোকচিত্রীরূপে যুক্ত হয়েছিলেন। শ্রীকর্মকারের হাইকন্ট্রাস্ট লাইটিং ফোটোগ্রাফির কারণে ইন্ডাস্ট্রিতে খুবই সুনাম অর্জন করেছিল। এবং সেই সুখ্যাতিও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর সেই সৃজনধর্মী ও পরীক্ষামূলক কাজ, রাজ কাপুরের চোখ না এড়িয়ে যাবার দরুন তাঁর কাছ থেকে প্রথম আমন্ত্রণ পান আর. কে. ফিল্মসে যোগ দিতে। 'আওয়ারা' ছবির চিত্রগ্রাহকের দায়িত্ব নেবার জন্য। এরপর আর তাঁকে কখনো পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৫১ সালে 'আওয়ারা'র পর প্রায় আজীবনই রাজ কাপুরের সঙ্গলাভ করেছেন। আর. কে. ফিল্মস-এর ব্যানারেই ১৯৫৬ সালে অমিত মৈত্র ও শম্ভু মিত্রের যৌথ নির্দেশনায় ডবল ভার্সান ফিল্ম—'জাগতে রহো' ও 'একদিন রাত্রে'র চিত্রগ্রহণ করেন। তাছাড়াও অন্যান্য বহু প্রোডাকসনের কাজেও নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন। ১৯৫০ সালে রাজ কাপুরের প্রেরণায় রাধু কর্মকার 'জিস দেশ মে গঙ্গা বহেতী হ্যায়' ছবিটি পরিচালনা করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি ও সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে নবম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড মনোনীত হয়ে পুরস্কৃত হয়। এছাড়া অষ্টম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানে হিন্দি বিভাগে সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনি-চিত্র হিসেবে 'সার্টিফিকেট অফ মেরিট' সম্মানে ভূষিত হন। সিনেমাটোগ্রাফারের 'মশাল' এবং 'সমর'-এর ঠিক পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে, রাজেন্দ্র জৈন-এর প্রযোজনায় তিনি তৈরি করেন আইয়াম বাজিদপুরীর কাহিনি-নির্ভর 'দিদার' ছায়াছবি। মাল্টিস্টারার ফিল্ম বলতে যা বোঝায়, অনেকটা তেমনি ছিল তার গঠন। অশোককুমার, দিলীপকুমার, নার্গিস, মিম্মি, আগা মিরাজ, মোতিলাল, টুনটুন, পরীক্ষিত সাহানী, তবসুম (শিশু) এবং ইয়াকুব। সকল অভিনেতাই গল্পের ভেতর নিজস্ব চরিত্র এবং চরিত্রের সঙ্গে পারস্পরিক যে সম্পর্ক, তার টানাপোড়েন, উত্থান পতন এবং অজানা পরিণতিতে পৌঁছোতে, নিজেদের যথাযথভাবে খাপ খাইয়ে, বিশ্বাসযোগ্য অভিনয়ের সঙ্গে প্রকাশ করতে পেরেছেন। কাহিনির মূল বিষয় হল—অপূর্ণ প্রেমের এক অসামান্য আকুতি। যে ভালোবাসার জন্ম শৈশবের আঁতুড় ঘরে, সেই বাল্যপ্রেম শেষ পর্যন্ত মিলনের বদলে বিচ্ছেদে গিয়ে

পরিণতি পেল শুধুমাত্র শ্রেণিবৈষম্যের অজুহাতে। ভালোবাসাবাসির দুইজন মানুষ অসম শ্রেণির। যে সমাজ শ্রেণিগত ব্যবধানের মূল নিয়ন্ত্রক, সেখানে প্রেম-ভালোবাসার সামাজিক বিধান এবং তার সালিশি নির্ণয় হল—প্রেমিক-প্রেমিকার এটা অমানবিক চর্চা মাত্র। এই সমাজ হিসেবি প্রেম ভালোবাসাকেই উৎসাহিত করে, মদত জোগায় ও অনুমোদন দেয়। 'দিদার'-এর একটা দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেটা হল, অতীতের যে সব হিন্দি সিনেমার শেষ পরিণতি বিয়োগান্ত বা ট্র্যাজিডিতে রূপান্তরিত হত, তার মধ্যে এই 'দিদার' এক বিশেষ অর্থে অন্যতম। কেননা, চূড়ান্ত ট্র্যাজিক পরিণতি সত্ত্বেও (যা সাধারণত দর্শকরা মেনে নিতে পারে না) ছায়াছবির সুবর্ণ যুগে রিলিজ হবার পর দর্শকে ভীষণভাবে সাড়া দিয়েছে। এমনকি জনপ্রিয় ছবি হিসেবে সুখ্যাতি পেয়েছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে এও সাব্যস্ত হয়েছে দর্শকের কাছে—দিলীপকুমার প্রকৃতই একজন 'কিং অফ ট্র্যাজিডি'। তাঁদের অকুণ্ঠ গ্রহণযোগ্যতাই ছিল এই চলচ্চিত্রর স্বীকৃতির মাপকাঠি।

বহু বছর পর 'দিদার' যখন আবার মুম্বাই-এ থিয়েটার হলে প্রদর্শিত হয়, অভিনেতা মনোজকুমার পরিচালক রাজ খোসলাকে অনুরোধ করেন, ছবিটা তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে বসে দেখার জন্য। আমরা জানি পরবর্তীকালে এই গল্প-কাঠামোর নির্যাস থেকে পুনরায় খসড়া রচনা করার পর ১৯৬৬ সালে 'দো বদন'-ছবিটি তৈরি হয়। সেই ছবিটিও আর্থিক আনুকূল্যে বাজিমাত করে হিট হয়েছে। এক্ষেত্রে সংক্ষেপে সংযোজিত হতে পারে ১৯৯৩-এ সাহিত্যিক বিক্রম শেঠের 'এ সুটেবল বয়' উপন্যাসে উল্লিখিত যে ছবির কথা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সেখানে দর্শক সমাজ ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে চোখের জলে আবেগে ভেসেছে।

দিদার-এর চিত্রগ্রাহক ছিলেন দিলীপ গুপ্ত। ফোটোগ্রাফিক ট্রিটমেন্টের পরিকল্পিত অনেক ভাবনাই নীতিন বোসের ছিল। সাউন্ড রেকর্ডিস্ট তো মুকুল বোস ছিলেনই সঙ্গে।

মেইনস্ট্রিম ভারতীয় ছায়াছবি কণ্ঠসঙ্গীতবিহীন হবে এটা কল্পনা করা সম্ভব নয়। গল্পের যেমন বিন্যাস সেই মতো মানানসই কথা সুর ছন্দ ও তালের ঐকতানে সমন্বয়সাধন করতে পারলে গল্পের গতি বেড়ে যায়। তাতে দর্শকও আকর্ষণ বোধ করে, মনোরঞ্জনের উপকরণ হিসেবে। সংগীত থাকা মানেই দৃশ্যের একঘেয়েমি বা অজস্র সংলাপের বোঝা থেকে কিঞ্চিৎ মুক্তি। সে কণ্ঠসঙ্গীতই হোক বা যন্ত্রসঙ্গীতই হোক, যাকে এককথায় বলা হয় 'রিলিফ'। আর নীতিন বোসের ছবির ক্ষেত্রে তো স্বর-সঙ্গীত একটা বিশেষ মাত্রা বহন করে। একটি বা দুটি নয়, 'দিদার'-এ রয়েছে প্রায় বারোটি গান। গানগুলির গীতিকাব্য রচনা করেছেন—শকিল বাদাইয়ুনি। আর গানগুলি ছাড়াও সমগ্র চলচ্চিত্রের আবহসঙ্গীত নির্দেশক রূপে সুর সংযোজন করেছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক অদ্বিতীয় প্রবাদপ্রতিম ভারতীয় সুরকার নৌশাদ। বাষট্টি বছরের সংগীত জীবনে যাঁর অবদান রয়েছে সাতষট্টিটি সুরারোপিত ছায়াছবি। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অত্যন্ত মুষ্টিমেয় সঙ্গীত পরিচালকই

ছিলেন, যাঁদের সব ছবির গানই নৌশাদের মতো প্রায় কোনো-না-কোনোভাবে সমাদৃত ও জনপ্রিয়। মার্গীয় ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আশ্রয়ে শ্রুতিমধুর সুর সৃষ্টি করেও, তিনি কখনোই রাগরাগিণী চর্চার ক্ষেত্রে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করতে চাননি কখনো। নীতিন বোসের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় সৃষ্টি হল 'গঙ্গা যমুনা' ছবি। ১৯৬১ সালে বোম্বের ফিল্মিস্তানের ব্যানারে প্রযোজিত। ভোজপুরী ভাষাতে তৈরি, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এমন বিপুল আর্থিক সাফল্য অর্জন আর মাত্র দু-একটি ছবির ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছে। একসময় ছবিটি দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষাতেও রিমেক হয়েছে। সেকালের সুপ্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় শিল্পীদের উপস্থিতি ছিল আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রীয় কারণ।

বলা প্রয়োজন, নীতিনের ছবিগুলিতে বিষয় ও বক্তব্যকে ত্বরান্বিত করার উপযোগিতায়, স্বর সঙ্গীত বা কণ্ঠ-সঙ্গীতের ব্যবহার অবশ্যই এক অন্য মাত্রায় গল্প এবং চরিত্রগুলি প্রাধান্য পায়। তাই সেদিক থেকে 'গঙ্গা যমুনা'ও কোনো ব্যতিক্রম নয়। ছায়াছবির নামগুলি দর্শক-শ্রোতাকে অত্যন্ত আবেগমথিত ভাবে মাতিয়েছে। একসময় মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে সেই সব গান। শুধুই কি তাই, গানগুলির পিকচারাইজেশন বা দৃশ্যায়ন সকলকে অভিভূত করেছে।

'গঙ্গা যমুনা'র গল্প ও চিত্রনাট্য রচনা করেন ছবির প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা-নায়ক দিলীপকুমার স্বয়ং। সংলাপ লেখেন ওয়াজাত মির্জা। দিলীপকুমারের এই বর্ণনাকর আখ্যানকে দৃশ্যরূপে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁর প্রথম অবদান, তিনি হলেন নির্দেশক নীতিন বোস। অভিনয় ব্যতিরেকে, অনবদ্য কাব্য কথায়, সুললিত সুর সঙ্গীতে এবং শ্রুতিমধুর কণ্ঠ মূর্ছনায় যিনি শ্রোতা-দর্শককে মাতিয়েছিলেন তিনি হলেন গীতিকার শকিল বাদাইয়ুনি। মোট আটটি গানের লিরিকস্ অর্থাৎ গীতরচনা করেছিলেন। এবং যিনি সুষম শ্রুতিনন্দনে সুর সংযোজন করে শ্রোতাদের মন আপ্লুত করতে পেরেছিলেন, তিনি আর কেউ নন, সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী নৌশাদ। ভারতীয় সিনেমায় বিশেষত হিন্দি ছবিতে তাঁর যে অসীম অবদান—সে বিষয়ে যতই আলোচনা হোক, তবু শেষপর্যন্ত যেন মনে হয় কমই বলা হল। লতা মঙ্গেশকর, মহম্মদ রফি, আশা ভোঁসলে এবং হেমন্তকুমারের সৃজনশীল মধুর কণ্ঠসঙ্গীত, অবশ্যই ছবির ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যতিক্রমী সম্পদ মনে করার কারণ রয়েছে। নীতিন নিজে সিনেমাটোগ্রাফির কাজ না করে ভি. বাবাসাহেবের হাতে সেই দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। তার জন্য বাবাসাহেব যেমন সম্মানিত হয়েছেন, তেমনি তাঁর সমৃদ্ধ ফোটোগ্রাফির কারণে, স্বদেশে ও বিদেশে বহুভাবে পুরস্কৃতও হয়েছেন। ছবির সম্পাদনার কাজে সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত ছিলেন সুবিখ্যাত চিত্র পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জি। ফিল্মিস্তানে মেহেবুব স্টুডিয়োতে টেকনিকালার এই ছবির মোট সময়সীমা ছিল—দু-মিনিট কম তিন ঘণ্টা। সম্পাদনা, সঙ্গীত ও অভিনয়ের উৎকর্ষে এবং তদুপরি কাহিনির ধারাবাহিক দৃশ্য পরম্পরার স্বতঃস্ফূর্ত গতিবিধির ফলে ছবি শুরু

ও শেষ হবার আগে পর্যন্ত এই লম্বা সময়ের হিসেব অনুভব করা যায় না। চরিত্রচিত্রণে মুখ্য ভূমিকাগুলিতে প্রাণঢালা নিঃসঙ্কোচ অভিনয়ে তুষ্ট করেছেন—দিলীপকুমার (গঙ্গারাম) বৈজয়ন্তীমালা (ধন্নু) লীলা চিটনিস (মা-গোবিন্দী) আনোয়ার হুসেন (জমিদার) নসিব খান (ভাই-যমুনা) নাসির হুসেন (পুলিশ অফিসার) ছাড়া ছিলেন আজরা কানহাইলাল, হেলেন এবং শিশুশিল্পী অরুণা ইরানী। নির্বাচিত প্রত্যেক অভিনেতাই নিজস্ব ভূমিকায় ছিলেন যথার্থ উপযুক্ত।

নীতিন বোসের সব ছবির ক্ষেত্রে তৎকালীন সামাজিক রোমান্টিকতা এবং বিপরীতে সামাজিক সম্পর্কের ভেতর জিঘাংসার প্রতিফলন যেভাবে চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তা মননের মেলোড্রামা রীতি-নীতি ও আঙ্গিকেরই একপ্রকার প্রতিফলন। তখনকার অভিনয়ের ধরনে ও উপস্থাপনায় বেশ খানিকটা অতিনাটকীয় ঢঙ থাকাই ছিল স্বাভাবিক প্রকাশ। তাই সমসাময়িক চলচ্চিত্রগুলি এই মেলোড্রোমার রেশ থেকে মুক্ত হতে না পারার কারণেই, তৎকালীন অভিনয় পদ্ধতি ও রীতি অনেকাংশে একইরকম পরিলক্ষিত হয়। প্যারালাল সিনেমা বা নয়া বাস্তববাদ সিনেমার ক্ষেত্রে যে বাস্তবানুগ প্রয়োগ দেখা যায়, অর্থাৎ স্পষ্টভাবে বলা যায় রিয়েলিস্টিক অ্যাক্টিং, রিয়েলিস্টিক ডায়লগ থ্রোয়িং, রিয়েলিস্টিক ফ্রেম ওয়ার্কে সমস্ত রিয়েলিস্টিক ব্যাকড্রপ থাকে—সেসব অন্বেষণ করা এখানে অবান্তর। তবু বলব আজকের দিনে প্রায় পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় পার হবার পরও মূলস্রোতের ভারতীয় ছবি যে নির্মাণের রীতি পদ্ধতি ও আঙ্গিক ব্যবহার করে চলেছে—তাতে মনে হয় সেই অতীত ষাটের দশকের মেলোড্রামাকেও যেন হার মানাচ্ছে। অবিশ্বাস্য বোধ হয়, আজকের আধুনিক ছবি মনে ভাবতে। গল্পের প্লট থেকে শুরু করে চরিত্রের মুভমেন্ট, মোশন, অ্যাটিটিউড—সবই কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়। যেন কৃত্রিমতায় ভরা সৃষ্টি। চলচ্চিত্র গ্রামারের যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতি ছাড়াই পরিচালক ও প্রযোজকের উদ্ভট চিন্তায় কোনোভাবে বৃত্তকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা। আর ছবির চরিত্রগুলি বাস্তবতার ত্রিসীমানার বাইরে দাঁড়িয়েই যেন মেকি বাস্তবতাকে বেশি মূল্য দিয়ে চলেছে। সেই তুলনায় 'গঙ্গা যমুনা'কে দেখে অনেক বেশি আধুনিক বলে বিবেচিত হলে বিস্ময়ের কিছু নেই। 'গঙ্গা যমুনা'র ডায়লেক্ট মূলত ভোজপুরী বাঁধা বুলিতে উচ্চারিত। অভিনীত শিল্পীদের অনায়াস ও স্বচ্ছন্দ সংলাপ প্রকাশে বাস্তবিকই বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। অথচ তাঁরা কেউই ভোজপুরী ভাষাভাষীর মানুষ নন।

১৯৬১ সালের জানুয়ারিতে ছবি রিলিজ করার সময় খরচ হয়েছিল আনুমানিক ৩৫ মিলিয়ন টাকা, এবং ওই বছরই ছবি বক্স অফিস হিট হওয়ায়, দেখা গেছে ৭০ মিলিয়ন টাকা উঠে এসেছে। এরপর ২০১০ সাল অবধি হিসেব করে দেখা গেছে—৭.৩৬ বিলিয়ন টাকা পাওয়া গেছে। এ থেকেই সহজে অনুমান করা যায়, গঙ্গা-যমুনার দর্শক

চাহিদা আজও তেমন আছে। শুধু আগের প্রজন্ম নয়, এ প্রজন্মের দর্শকের কাছেও ছবির বিনোদনমূলক উপকরণ যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

যদিও তৎকালীন বাঙালি পরিবারের বাবা-কাকা-জেঠিদের কাছে হিন্দি ছবি মাত্রই ব্রাত্য ছিল। তখন পরিবারে বাংলা ছবি (বই) দেখারই চল ছিল মূলত। অভিভাবক ও গুরুজনরা তখন শুধু সাহিত্যনির্ভর ছায়াছবিকেই প্রাধান্য দিতেন। বিশেষত হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে পারিবারিক সদস্যদের আগ্রহে জল ঢেলে দিতেন—অনুমতি তো দূরের কথা, বাধা দিতেন—নৈব নৈব চ। তাঁদের কট্টর ধারণা ছিল হিন্দি,ছবি মানেই ফিচ্‌লেমি এবং অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য জীবনের কল্পরূপ। শিক্ষণীয় বলে কিছু থাকে না। কথার মধ্যে অবশ্যই আংশিক সত্যতা থাকলেও, তাঁরা কিন্তু কখনোই বোঝার চেষ্টা করেননি কিছু ছবিতে কতখানি শিক্ষণীয় ছিল।

এই ছবি মূলত একদিকে শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব এবং অন্যদিকে দুই ভাইয়ের পরস্পর নীতি বিরোধিতাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। হরিপুর নামে একটি গ্রামে বড়ো হয় দুই ভাই। গঙ্গারাম ও যমুনা। গঙ্গারাম ছোটোবেলা থেকেই মায়ের কাজে সহচর। এবং দুরন্ত প্রকৃতির বলা যায়। বেপরোয়া ও মেধাবী। আর যমুনা সুশীল, পড়াশুনায় আগ্রহ ছিল। মনোযোগী। তাঁদের মা গোবিন্দী—অত্যন্ত সৎ ও নিরীহ এক দরিদ্র পরিবারের বিধবা। জমিদার বাড়ি কাজ করে অন্নবস্ত্র জোটায়। জমিদার ও তার স্ত্রী দুজনেই ছিল অত্যন্ত কুৎসিত মানসিকতার ও জঘন্য প্রকৃতির। জমিদার হবার সমস্ত দোষই বিদ্যমান ছিল।

দুই ভাই প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন হলেও, ছোটোভাই যমুনার প্রতি গঙ্গার অসীম স্নেহ-ভালোবাসা ছিল। অশান্ত হলেও গঙ্গার মনটা ছিল খুব সরল ও সাদাসিধে। ভাবত তার রোজগারের পয়সা ভাইয়ের ভালো শিক্ষার জন্যই ব্যয় করবে।

হঠাৎ একসময় দেখা যায়, জমিদার হরিরামের স্ত্রী শয়তানি করে গোবিন্দীকে চোর অপবাদে অভিযুক্ত করে। পুলিশি তল্লাশির পর কৌশলে সাক্ষী সমেত মিথ্যা প্রমাণ করে। গোবিন্দীর ঘর থেকেই বামাল উদ্ধার হয়েছে। অতএব তাকে গ্রেফতার করে। গোটা গ্রামের মানুষ গোবিন্দী সম্পর্কে এই দুর্নাম কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। তারা বুঝতে পারে জমিদারের বদ মতলবে এটা হয়েছে। তাই সকলের সাহয্যে ও সহযোগিতায় সে ছাড়া পেলেও অপমানে, লাঞ্ছনায় এবং প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে গোবিন্দী আর বেশিদিন বাঁচেনি। মায়ের অবর্তমানে গঙ্গা নিজেকে জমিদারের কর্মশালায় (শস্যমজুত গুদামে) বন্ধক রাখে। ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ জোগাতে হবে। ভাইকে পরে শহরেও পাঠায় শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে।

এরপর সময়ের চাকার অগ্রগতির সঙ্গে দুজনেই পূর্ণবয়স্ক যুবক হয়। গঙ্গার ভূমিকায় অভিনয় করেন দিলীপকুমার। যে অত্যন্ত পরিশ্রমী ও আত্মশক্তিতে ভরপুর একজন শ্রমিক। এবং নির্ভীকভাবে প্রয়োজনমতো নিজের প্রাপ্য সে জমিদারের থেকে বুঝে

নিতে জানে। আর যমুনা, ধীরস্থির শান্ত। অতি সতর্কতার সঙ্গে জীবনের সীমা পরিসীমা বিনয়ের সঙ্গে মেনে নেয়। যমুনার ভূমিকায় অভিনয়ে ছিলেন নাসিব খান। যিনি ব্যক্তিগত জীবনেও ছিলেন দিলীপকুমারের আপন ভাই। গঙ্গা গোরুর গাড়ি নিজে চালিয়ে জমিদারের কৃষিদ্রব্য বহন করে বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করত। তার কষ্টার্জিত টাকার সিংহভাগই ভাইয়ের পড়াশোনার জন্য শহরে পাঠাত। কিন্তু জীবন কি এত সহজ সরল সমীকরণে চলে! বিশেষত যে গ্রামে শোষক, উৎপীড়ক, অত্যাচারিত জমিদারের বাস। জীবন জটিল থেকে আরো জটিলতর হয়। একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহুদিন থেকে গ্রামের মেয়ে ধন্নু (বৈজয়ন্তীমালা অভিনীত)-র ওপর জমিদারের একটা কুদৃষ্টি ছিল। সেটা কেউ না জানলেও প্রকাশ পেল একদিন, ধন্নু যখন নির্জন নদীতে একা স্নান সারতে গেছে, তখন সেই লম্পট জমিদার ধর্ষণের উদ্দেশ্যে ধন্নুর অলক্ষ্যে সেখানে পৌঁছে হঠাৎ প্রবল আক্রমণ করে। সময়মতো গঙ্গার উপস্থিতি এবং জমিদারকে বেদম প্রহারের ফলে ধন্নু সে যাত্রায় রক্ষা পায়। কিন্তু জমিদার অপমানের প্রতিশোধস্পৃহায় গঙ্গাকে ছাড়ে না। গঙ্গা যখন জমিদারের থেকে পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিতে গিয়েছে, ঠিক সেই সময় জমিদার তুরুপের তাসটি সুযোগ বুঝে ফেলে—মিথ্যা ডাকাতির অভিযোগ করে গ্রেপ্তার করায়। অন্যদিকে গঙ্গা জানতে পারে তার ভাই-ও জমিদারের ক্রোধোন্মত্ততার শিকারের ফলে তার বশংবদ লোকের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে লুণ্ঠিত হয়েছে। অর্থের অভাবে প্রায় সে নিঃস্ব জীবনযাপন করছে। দাদার কাছ থেকে কিছুই না পেয়ে, জীবনধারণ ও পড়াশোনা চালাবার জন্য গচ্ছিত যা ছিল সব বেচে দেয়। আর গঙ্গা কোনোরকমে আইনের অধীন থেকে পালিয়ে ধন্নুকে সঙ্গে নিয়ে এক দুস্যদলের পান্ডা হয়। পলাতকা হয়ে নির্জন ও জনবসতিহীন প্রান্তরে তাঁবুর মধ্যে জীবনযাপন শুরু করে।

ইতিমধ্যে যমুনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় পিতৃপ্রতিম এক পুলিশ অফিসারের। তারই সহানুভূতিতে যমুনা পুলিশ অফিসারের মর্যাদায় স্বীকৃত হয়। পুলিশের চাকরির শুরুতেই প্রথমে তার পোস্টিং হয় অন্য কোথাও নয়, তার নিজের গ্রাম হরিপুরে। যেখানে তার আশৈশব সম্পর্ক, দীর্ঘদিন পরে ফিরেছে নিজের জন্মস্থানে। শৃঙ্খলার মধ্যে আপন দাদাকে কবজা করতে হবে। পেশাগত কর্তব্য এবং পরিবারের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করতে হবে খুব ধীর-স্থির ভাবে। অন্যদিকে সমাজ জীবন ছেড়ে দস্যুদলে যুক্ত হবার বছর খানেক পরে গঙ্গা টের পায় প্রসবাসন্ন ধন্নু সন্তানের মা হতে চলেছে। সিদ্ধান্ত নেয় গ্রামে ফিরে শাস্তি মুকুবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। কিন্তু যমুনা চেয়েছে গঙ্গা আগে আত্মসমর্পণ করুক পুলিশের কাছে তার অপরাধের কারণে। তারপর আইনের নির্দেশমতো শাস্তির বিধান যা হবে, সেটাই মানতে হবে। গঙ্গা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় যমুনা বাধ্য হয়েই তখন গঙ্গাকে গুলি করে। গঙ্গার মৃত্যুর পর যমুনার কাছে আসল সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়—তার পড়াশোনা ও শিক্ষার সমস্ত ব্যয়বহন ছাড়াও একজন সরকারি চাকুরিজীবী, মর্যাদাসম্পন্ন

পুলিশ হবার পেছনেও ছিল তার দাদা গঙ্গারামের যথেষ্ট অবদান। তখন সে অনুতপ্ত হলেও কিছুই করার থাকে না। তাই গঙ্গার মৃত্যু যমুনাকে প্রতিনিয়ত অনুশোচনায়, যন্ত্রণায় বিপন্ন করে তোলে। এটাই এ-ছবির মূল বিষয়।

মৌলিক এই গল্পের অনুকরণে তামিল ভাষায় যেমন দুবার ছায়াছবি তৈরি হয়েছে, তেমনি ১৯৭৫ সালে হিন্দিতে 'দিওয়ার' ছবিও হয়েছে, অমিতাভ বচ্চন, শশী কাপুর অভিনীত। তবে শেষপর্যন্ত কোনো ছবিই গঙ্গা-যমুনার ধারেকাছে আসতে পারেনি। না আর্থিক সাফল্যে, না জনপ্রিয়তার উচ্ছ্বাসে।

এ ছবি দর্শক ও সাংবাদিকদের থেকে যেভাবে ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে, তা আজও অক্ষুণ্ণ। বাণিজ্যিক সাফল্যর কথা আগে বলা হলেও, আরও কিছু তথ্য সংযোজন করতে পারলে ভালো হয়। বোম্বে ছাড়া অন্যান্য অনেক রাজ্যেই সিলভার জুবিলি ছাড়িয়ে গোল্ডেন জুবিলির পথও পেরিয়েছে গঙ্গা যমুনা। শুধু কি তাই, চলচ্চিত্র পরিসংখ্যান তথ্য জানাচ্ছে—পঞ্চাশ বছরের সর্বোচ্চ আর্থিক দিক থেকে সফল পঞ্চাশটি জনপ্রিয় ছায়াছবির নিরিখে দেখা গেছে, প্রথম নাম রয়েছে ১৯৬০ সালে কে-আসিফ পরিচালিত এবং নৌশাদ সুরারোপিত দিলীপকুমার, মধুবালা, পৃথ্বীরাজ কাপুর অভিনীত 'মোঘল-এ-আজম' চলচ্চিত্রের। এবং তারপরই যে ছবির নাম, সেটি হল 'গঙ্গা যমুনা'। তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বাজেটে তৈরি। ১৯৬১ সালেই সাত কোটি টাকার বাণিজ্য করেছিল। বলা হয় সর্বকালের অন্যতম ব্লকবাস্টার ছবি।

দেশ বিদেশ থেকে চলচ্চিত্র সমালোচকদের যে অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে—তা এককথায় অভূতপূর্ব। কি ছিল তাদের বিশ্লেষণ, তাদের বক্তব্যের সারাংশ ছিল—

যথার্থ ভৌগোলিক পরিবেশে এবং আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে তৈরি হওয়া 'গঙ্গা যমুনা' চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ভাষা ছিল একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভোজপুরী ভাষা ব্যবহার বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে তার যে উচ্চারণ প্রণালী এবং বাচনরীতি ও ভঙ্গির প্রকাশ ছিল, যথাযথ সফল মাপকাঠির তা অন্যতম এক মাত্রা।

মনে রাখতে হবে ছায়াচিত্রের ধন্নু-রূপী অভিনেত্রী বৈজয়ন্তীমালা দর্শকের মন কেড়ে যে প্রশংসা পেয়েছেন এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান অর্জন করেছেন, তার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি হরিপুর গ্রামের অতি সাধারণ ও সাদামাটা একজন স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর অতীব সহজ, সরলমনা চেহারায় ও আচরণে যে স্বাভাবিক মাধুর্য ছিল, সে-সবই দর্শককে ভীষণভাবে আপ্লুত করেছে। এবং ভুলে গেলে চলবে না, সেকালে তিনি ছিলেন একজন সর্বাধিক সৌন্দর্যপূর্ণ আকর্ষণীয় নায়িকাদের অন্যতমা। রীতিমত গ্ল্যামারাস হিরোইন। তা সত্ত্বেও যেভাবে তিনি স্থানীয় আদিবাসী ভাষা আয়ত্ত

করে ভোজপুরী ডায়লেক্টকে অকৃত্রিমভাবে অণুকরণ করে সংলাপ প্রকাশ করেছেন—সেটা সত্যিই শুধু ঈর্ষণীয় নয়, বরং বলা যায় বিরল প্রতিভার এক নিদর্শন।

আবার কোনো কোনো সমালোচনায় বলা হয়েছে, 'গঙ্গা যমুনা' সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয়, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পটভূমিকে গুরুত্ব দিয়ে, একটা শক্তিশালী গল্পের ভিত গড়েছে। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার দলিল চিত্রের সঙ্গে হয়ে উঠেছে এক শ্রেষ্ঠ চিরন্তনী চিত্তবিনোদনের ছায়াছবি। দৃঢ়তার সঙ্গে সেখানে অভিনয়, ফোটোগ্রাফি, সম্পাদনা এবং সংগীতের মেলবন্ধন পূর্ণ হয়েছে। এই সকল ব্যবহারিক কুশলতা, ছবির প্রতি মনোযোগী টান, দর্শকের চোখ খুলে দেবার জন্য যথেষ্ট। কেন একটা ভালো গল্পের বা ভালো ছবির জন্য প্রয়োজন হয় সুপারস্টার? অথবা কেন আঙ্গিককে নিয়ন্ত্রণ করে বিষয়বস্তু—সেটাও ভাবা প্রয়োজন। মানবিক সমস্ত সম্পর্কের বিয়োগান্ত আয়রনি হল, গঙ্গা যমুনার অন্তরাত্মাকে অবিষ্কার করা এবং গঙ্গা ও ধন্নুর মর্মন্তুদ সম্পর্ক—যেখানে গল্পে নিহিত রয়েছে, দুটি অতি সাধারণ মানুষের ভেতরকার ভালোবাসার কথা। পরিচালক তাঁর অনন্য কৃতিত্বের সঙ্গে ও বিশেষ মননশীলতায়, শক্ত হাতে প্লটের বিস্তার ও বিশ্লেষণে কৃতকার্য হয়েছেন।

গ্রামীণ জীবনে লোকচর্চার অঙ্গ হিসেবে সেখানে জমকালো নাচগানের মধ্য দিয়েই তাদের আনন্দ উৎসব উদ্‌যাপনের যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গেছে—তাকে আতিশয্য বলে অনুভূত হলেও মনে রাখতে হবে, বাস্তবজীবনেও কিন্তু তাদের খুশির উচ্ছ্বাস বা আনন্দের প্রকাশ খানিকটা লাগামহীন হয়। নাগরিক সভ্যতার মতন তাদের আচরণ বিধিসম্মত ব্যাকরণ মেনে হয় না। এবং তা সম্ভবও নয়। আর যদি-বা হয়, তবে সেটা হবে প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। গ্রামের মুক্ত পরিবেশে তাদের নাচ, গান, আনন্দ, দুঃখ বা চিৎকার সবেতেই আর্তিও থাকে আবার প্রাণখোলা উদ্দামতাও থাকে। এটাই তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই কথাগুলি সবই গঙ্গা যমুনার দৃশ্যগুলির কথা মনে রেখেই বলা। তাই নীতিন সেই লোকসংস্কৃতির রূপরেখাকেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে মনে হয় কিছুটা তো ধরতে পেরেছেনই। এবং প্রাসঙ্গিক কারণেই নায়ক দিলীপকুমার সম্পর্কেও কিছু বলা আবশ্যক। দিলীপকুমার তাঁর অভিনয়ে কখনোই স্বভাববিরুদ্ধ মেলোড্রামাকে প্রশ্রয় দেননি। সমগ্র ছবিতে তাঁর অসাধারণ বাস্তবসম্মত অভিনয়ের কথা বাদ রেখে, যদি শুধু একটা ভোজপুরী গানের কথা বলা যায়— যেখানে তাঁর নৃত্যের চলন, ছন্দ ও উপস্থাপনা দর্শককে মাতিয়েছিল, সে নাচের দৃশ্য দেখে কেউ মুগ্ধ না হয়ে পারবে না। অবশ্যই জোরের সঙ্গে দাবি করা যায়—সম্পূর্ণ ওই লোকনৃত্যের আঙ্গিকে তাঁর নৃত্যকলা-ভঙ্গি এবং তাঁর নৃত্য কৌশলের যে দাপট ছিল, তার ধারেকাছে বোম্বের ইন্ডাস্ট্রির কোনো

নায়ক, শুধু সেকালে কেন, একালেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অপূর্ব মানিয়েছিল তাঁকে সেই নাচের দৃশ্যে, যা কখনো ভোলার নয়।

'গঙ্গা যমুনা' নানাভাবে প্রশংসিত হবার পর, সম্মানিত পুরস্কারগুলি কি ছিল দেখা যাক :

১) বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে সর্বাধিক নয়টি পুরস্কার ছবিটি পেয়েছে যথাক্রমে—শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবি, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার, শ্রেষ্ঠ গীতিকার, শ্রেষ্ঠ সিনেমাটোগ্রাফার এবং শ্রেষ্ঠ শব্দ ও ধ্বনিগ্রাহক।

২) বোস্টন ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভেল—পল রিভেরি বোল (ফর ক্ল্যারিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি ইন দ্য প্রেজেন্টেশন অফ কনটেম্পোরারি ইস্যু অ্যাজ প্রোডিউসার)

৩) চেকোশ্লোভাক অ্যাকাডেমি অফ আর্টস—প্রাগ্ থেকে একমাত্র দিলীপকুমারকেই স্পেশাল অনার ডিপ্লোমা দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

৪) নবম ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে স্বীকৃতি পান—শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বৈজয়ন্তীমালা, শ্রেষ্ঠ সংলাপ—ওয়াজাহাত মির্জা, শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রী—ভি. বাবাসাহেব এবং শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত রচয়িতা নৌশাদ।

৫) পঞ্চদশ কার্লোভেরি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ক্রিস্টাল গ্লোব-এর জন্য ভারতের অফিসিয়াল সাবমিশন ছিল।

৬) নবম ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড-এ দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ হিন্দি ফিচার ফিল্ম, পরিচালক নীতিন বোস এবং অভিনেতা দিলীপকুমারের উদ্দেশ্যে পুরস্কার জয়ের ঘোষণা হয়েছিল।

সারাজীবন চলচ্চিত্রশিল্প সৃষ্টির সার্থক কৃতকর্মের জন্য যেমন অসংখ্য খেতাব লাভ করেছেন তেমনি ব্যক্তিগতভাবেও অজস্র পুরস্কার অর্জনে ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন নীতিন বোস। 'প্যার কা পিয়াসা' দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্রের জন্য 'সার্টিফিকেট অফ মেরিট' পাবার পরই সারাজীবন সাধনার যে অবদান তিনি রেখেছেন, তার জন্য তাঁকে জাতীয় চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'দাদাসাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে সম্মানিত করা হয় ও শ্রদ্ধা জানানো হয়। যে সম্মান ভারতবর্ষে হাতে-গোনা মাত্র কয়েকজন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বই পেয়েছেন। নীতিন বোস তাঁদের মধ্যে অন্যতম গ্রহীতা। এই পুরস্কার ১৯৬৯ সাল থেকে শুরু হওয়ার পর প্রথম গ্রহীতা ছিলেন বোম্বে টকিজের মালিক এবং নির্বাক যুগের নায়িকা দেবকী রানী। তারপর থেকে ২০১৩ পর্যন্ত মোট যত জন মানুষ গ্রহণ করেছেন, তথ্য অনুসারে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাঙালিই পেয়েছেন। মোট চোদ্দো জন।

নীতিন বোস উনিশ বছর বয়সে তাঁর পিতাকে হারান। যিনি ছিলেন তাঁর জীবন দেবতা, জীবন শুরু করার প্রেরণা। দশ-এগারো বছর বয়স থেকেই বাবার সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখতে যেতেন। সেই থেকেই তাঁর রক্তে, শিরায়, উপশিরায়, মগজের কোষে কোষে ঢুকেছিল চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্র। পরে বেশ বড়ো হয়ে ভাবতেন, যা না হলে তাঁর জীবন অচল হয়ে যাবে।

শৈশবে থেকেই বাবা তাঁকে সব সময় উৎসাহ দিতেন। স্কুল কলেজের পড়া ছাড়াও বলতেন, এটা কর, ওটা কর। তাহলে এটা পাবে, ওটা পাবে। কোনো খেলনা গাড়ি বা বন্দুক নয়, বলতেন মেশিন পাবে, প্রোজেক্টর পাবে, ক্যামেরা পাবে। এসব শুধু কথার কথাই ছিল না, কিনে এনেও দিতেন। 'বুক অন ফিল্ম টেকনিক' কিনে এনে বলতেন, পড়ে পড়ে নিজে নিজেই শিখতে পারবে। তাতে সেই কিশোরের লেখাপড়ায় উৎসাহ যেত আরো বেড়ে। এহেন বন্ধু-প্রতিম পিতাকে অল্পবয়সে হারিয়ে (১৯১৬) স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন নীতিন, তারপরের একবছর তিনি কিছুই করতে পারেন নি।

১৯২০ সালে তিনি প্রথম একটি কাজে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এক ভদ্রলোক ইস্টম্যান প্রোডাক্টসের এক আমেরিকান কোম্পানি থেকে এখানকার কাজকর্ম দেখতে এসেছিলেন। ওই ভদ্রলোক নীতিনকে বললেন এখানকার নিউজগুলি যার মধ্যে পাবলিক ইন্টারেস্ট আছে সেগুলি তুলে ইন্টারন্যাশনাল নিউজ রিল-এ পাঠিয়ে দিতে। সেই নির্দেশমতো তিনি প্রথম কিস্তি পাঠিয়ে দিলেন। ওঁরা সেই কাজের একশো তিন প্রিন্ট নিয়ে, নীতিন বোসকে একশো তিন ডলার পাঠিয়ে দেয়। টাকার অঙ্ক যাই হোক, নিজস্ব রোজগারের প্রথম পারিশ্রমিক নিয়ে মায়ের কাছে গেলে, মা ছেলেকে আশীর্বাদ করে তা গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'ওটাই তোমার ভাত-কাপড় দেবে।' এই ছিল তাঁর কর্মজীবনের সূচনা।

চলচ্চিত্র ভাবনা যাঁর ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার ছিল, সারাজীবন যিনি চলচ্চিত্রের কাজে নিজের অমূল্য সময় ব্যয় করেছেন, তিনি সার্থক সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণে কি ভাবতেন—শোনা যাক তাঁরই জবাদবন্দিতে—'প্রকৃত শিল্পী যিনি—সার্থক সাহিত্যের বিষয়বস্তুর উপর ছবি করার আগে প্রথমেই তাঁর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করবেন, তিনি দেখবেন correct interpretation হচ্ছে কিনা। এই correct interpretation-এর জন্য তিনি মনের মধ্যে কিংবা লিখে লিখে ছবি তোলার আগে বারে বারে চিন্তা করবেন। তাঁকে নিশ্চিত হতে হবে যে তিনি কোনোরকম distortion করছেন না—সাহিত্যের মূল সুরটিকে নষ্ট করছেন না। তারপর তিনি আস্তে আস্তে লিখবেন ছবির চিত্রনাট্য। লেখার পর সেটি বারবার পড়ে মনের মধ্যে তার ছবি দেখতে হবে, শেষে ক্যামেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে হবে সেটি সার্থক সাহিত্যের বাহক বা প্রতিচ্ছবি হচ্ছে কিনা।'

উল্লেখিত কথাগুলি কেবল তত্ত্বকথা নয়, তিনি নিজের বাস্তবিক কর্মজীবনে যেভাবে অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন, তারই সংক্ষিপ্তসার। চিত্রকর্মের কাজে প্রয়োজনমতো কাহিনি থেকে শুরু করে চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা সবই তাঁকে করতে হয়েছে বহুবার। 'ভাগ্যচক্র', 'দিদি', 'বড়ি বহেন', 'জীবন মরণ', 'দুষ্মন', 'দেশের মাটি', 'ধরতী মাতা', 'পরিচয়'—এইগুলির কাহিনি লেখার জন্য ওঁকে কলম ধরতে হয়েছে। 'ধূপছাঁও', 'দেশের মাটি' 'ধরতী মাতা' 'বিচার' এবং 'পরায়া ধন'-এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। একটা ছবির গঠন যাতে মজবুত কাঠামোতে গড়া যায় এবং গতিশীল রূপ পায় তার জন্য তিনি শুটিং পর্বের পূর্বেই পেপার ওয়ার্কের মাধ্যমে নিজস্ব পরিকল্পনাকে শক্তিশালী করে রাখতে চাইতেন। তিনি মনে করতেন পরিশ্রমটা আগেই বেশি করতে পারলে, পরের কাজগুলো অনেক ভালোভাবে করা যায় ও সহজও হয়। শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ'-এর সংলাপ লেখাও তাঁর কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই দায়িত্বটা অনকারো ওপর দেননি।

পরবর্তীকালে যদি সমসাময়িক সাহিত্যের মূল্য ব্যাহত হয়, তবে চলচ্চিত্রায়ণেও কি পরিবর্তন আনা উচিত—সেই প্রশ্নে তিনি মনে করতেন—না। 'আমার মনে হয় কোনো প্রকার পরিবর্তন না করে দর্শকদের জানানো উচিত কয়েক দশক আগে তাদের বাপ-ঠাকুর্দার আমলে দুনিয়া কেমন ছিল। তারা জানুক, তাদের বাপ-ঠাপুর্দার deeds ও misdeeds গুলি।

এছাড়া সাহিত্য-নিরপেক্ষ চলচ্চিত্র সৃষ্টির সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে নীতিন বোসের অভিমত ছিল—'সাহিত্য-নিরপেক্ষ চলচ্চিত্র নতুন কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে আজকের বোম্বের শতকরা নব্বই ভাগ ছবিই সাহিত্য-নিরপেক্ষ। নিউ থিয়েটার্সের আমলে আমরা যখন ছবি করেছি তখন আমরা খুব কমই সাহিত্য থেকে নিয়েছি। আসল কথা হচ্ছে যদি থিসিস থাকে, যদি অ্যান্টি থিসিস্ থাকে, যদি সিন্থিসিস্ থাকে তাহলে কেন ভালো ছবি হবে না? দক্ষ লোকের হাতেই সেটি সার্থক হয়।' এরপর তিনি বোম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে সমালোচনার সুরে প্রায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন—'বোম্বের ফিল্ম জগতের লোকেরা আজ কোনো কিছুরই কেয়ার করছে না। আমি দশটাকা ফেলব, আর বিশটাকা রোজগার করব। সেটার জন্য এই অন্যায় করব, এই distortion করব—দেখলাম বেশ সুন্দরভাবে পয়সা আসছে। আর এই পয়সার দৌলতে বোম্বের অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রোডিউসার, ডিস্ট্রিবিউটার কী লাইফ লীড করছে তা আপনারা সকলেই জানেন।' কলকাতা এবং বোম্বে দু'জায়গার ফিল্ম জগৎ সম্পর্কে ওঁর তুলনামূলক অভিজ্ঞ মতামত হল—'কলকাতা সম্বন্ধে আমার imspression হচ্ছে—বোম্বে যাবার আগে যদ্দিন আমি এখানে ছিলাম। মধ্যে অবশ্য দু-তিনটি বছর আমি এখানে কাজ করেছি। সেই সময়টার impression-এর ওপর ভিত্তি করেই বলছি

যে, তখন কলকাতায় যে routine ও discipline ছিল তার একটা অক্ষরও বোম্বেতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমি গালাগাল দিয়ে বলছি, ওখানে কেউ ডিসিপ্লিনের ব্যাপারে কেয়ার করে না। প্রোডিউসার, ডিস্ট্রিবিউটার জানেন, আমরা যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি।' এরপর তিনি নিজের কম বাজেটের ছবি কম সময়ে শুটিং শেষ করে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ দেখাতে পেরেছিল, সেই সব কথা বলার পর আবার বোম্বের ফিল্মকে এক হাত নিয়েছেন—'...কিন্তু বোম্বেতে যা হচ্ছে তা ভাষায় বলা যায় না।...বোম্বের ১০০টা ছবির ৯৫টা ফ্লপ করছে। এক একটা ছবি করতে কমপক্ষে ৩৫/৪০ লক্ষ টাকা লাগছে। সাধারণত ছবির খরচ হয় ৭০ লক্ষ টাকা এক কোটি টাকা। ভেবে দেখুন, কত টাকা down the drain চলে যাচ্ছে। But who cares?'

চলচ্চিত্রে অপসংস্কৃতির বিষয় বলতে গিয়ে বলছেন—'নিজে এসব ব্যাপার নিয়ে কোনোদিনই ভাবিনি তাই কিভাবে এসব হয় সে বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিনি। যদি আমি আবার ছবি করি তাহলে আমি আমার পুরোনো পথেই যাব কারণ সেটাই আমরা মেনে নিয়েছি ভালো বা উচিত বলে। কে কোথায় এ লাইন থেকে বেরিয়ে গিয়ে কী করছে তা ভাবতেই আমার ভালো লাগে না।' চলচ্চিত্র শিল্পসৃষ্টির কাজ সম্পর্কে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাজের সুর-ছন্দ-তাল বদলায় ঠিকই। নবীন প্রজন্মের কাজের যে ধরন, তার সঙ্গে পূর্বসূরিদের পদ্ধতির মিল হওয়া মোটেই সম্ভব নয়—সেটা সকলেরই জানা এবং কাম্যও বটে। নচেৎ নতুনভাবে এগিয়ে যাওয়া যায় না। তাহলে, তাদের কাজ, নীতিনবাবুদের মেনে নিতে আপত্তি কোথায়? আপত্তি সেখানে—যেখানে শিল্পের সততার প্রশ্নে মানুষ ভাবিত, এবং নীতিগর্হিত কাজের কারণে সৃজনশীলতা কলুষিত হয়। এমন কেউ কেউ আছেন, কিছু কিছু মানুষ থাকেন, যাঁরা সেসব কাজকে কখনো মান্যতা দেন না। মন থেকে মেনে নিতে পারেন যে, হতে পারে পূর্বসূরিদের শিল্পকর্ম সৃষ্টির ক্ষেত্রেও অনেক গলদ ছিল, না-জানা ভুল ছিল, অনেক কিছুর অভাব ছিল এবং কিছু সীমাবদ্ধতাও সেক্ষেত্রে ছিল, কিন্তু সততার প্রশ্নে কখনোই তাঁরা আপোশ করেন নি। সততাই ছিল সেকালে তাঁদের অন্যতম মূলধন এবং চাবিকাঠি। দর্শক ঠকিয়ে, বাণিজ্যিক প্রশ্রয় দিতে জানতেন না তাঁরা। চলচ্চিত্র শিল্প সৃষ্টির কাজে—'বাণিজ্যিক মূল্য' অপরিসীম ও অনস্বীকার্য ঠিকই, কিন্তু সেক্ষেত্রে বাণিজ্যই যদি সৃষ্টির একমাত্র প্রেরণা হয়, অথবা সৃষ্টিশীল কাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে, তবে সেই সৃজনশীলতাকে কোনোদিন বাণিজ্যিক শাসন, বাণিজ্যিক ক্ষমতা, বাণিজ্যিক হুঙ্কার দ্রুত গ্রাস করতে খুব বেশি সময় নেবে না।

ঘরানার বদল হয়তো খুব সহজেই মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু তার নৈতিকতা, তার আদর্শ, তার স্বচ্ছ কর্মরীতি, সবটাই বিবেচনার বিষয় হতে পারে। এবং হওয়াটাই আবশ্যক। কোন মানুষ কি দৃষ্টিভঙ্গিতে কীভাবে চলচ্চিত্রকে দেখতে চায়—সেটা বিচার

করা ভীষণ জরুরি। এবং তার থেকেই প্রতিপাদ্যরূপে প্রকাশ হয়—কেন সে চলচ্চিত্রকে, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রশ্নে, এই ভাবে ভাবে।

সর্বশেষে পুনরাবৃত্তি করি যে চিত্র পরিচালক ও চিত্রকলাকুশলী হিসেবে, সেকালে নীতিনবাবুদের সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতার নিরিখে, দর্শকের কাছে যে গ্রহণযোগ্যতা ছিল, সেটাই ছিল মূলত ওই প্রণম্য শিল্পী-মানুষের কাছে গুণগ্রাহী দর্শকের থেকে পাওয়া, গচ্ছিত অমূল্য মূলধন। শুধু মূলধনই বলব না—হাতিয়ারও বটে। যে হাতিয়ার ঢালের চেয়েও শক্তিশালী, কেউ তির ছুঁড়তে সাহস পাবে না, আর ছুঁড়েও কোনো আঘাত হানতে পারবে না। কেননা টাকা খাটিয়ে শুধু টাকা তৈরি করাটা তাঁদের পেশা ছিল না। বরং শিল্পভাবনায় টাকা বিনিয়োগ করে প্রকৃত চলচ্চিত্র সৃষ্টি করাটাই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য এবং বলা যায়, দর্শকের কাছে এবং শিল্পের কাছে এক দায়বদ্ধতা। সে কারণে নীতিন বোসের মতন চিত্র পরিচালকেরা আজও চলচ্চিত্র-প্রাঙ্গণে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলেই বিবেচিত হন।

জীবনের শেষদিন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর ১১ মাস ১৯ দিন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ১৪ এপ্রিল ১৯৮৬ সালে। চলচ্চিত্র ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রায় ৬৯ বছর। পেশার কাজে কলকাতা ছেড়ে বোম্বে গিয়ে বাড়ি কিনে বসবাস করলেও কলকাতার আদি নিবাস ত্যাগ করেন নি, ছিন্ন করেননি কোনোদিন জন্মসূত্র স্থান। চিরকাল যোগাযোগ রাখতেন, খবর রাখতেন কলকাতার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ধারাবাহিক উন্নতি সম্পর্কে। পরবর্তী সময় তাঁর জীবিকা বা পেশার অবসরপ্রাপ্তকালে জীবনান্তের বহুপূর্বেই স্থায়ীভাবে চলে এসেছিলেন নিজের জন্মস্থান কলকাতায়। যে কলকাতা তাঁকে অন্নসংস্থানের পথ নির্বাচন করার সুযোগ দিয়েছিল, তা আজীবন ভুলতে পারেন নি, ভোলেন নি তাঁর জীবনে কলকাতার কি অবদান।

অন্তিম বিদায়যাত্রাকালে, রেখে গেছেন জীবনসঙ্গিনী শান্তি বোস ছাড়া দুই কন্যা রীণা ও নীতাকে। এবং এছাড়া ছয়জন দৌহিত্র-দৌহিত্রী ও সাতজন প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রী।

নীতিন বোস-এর চলচ্চিত্রপঞ্জি

সাল	বিষয়	চলচ্চিত্রের নাম	
১৯২১	তথ্যচিত্র	(বেলজিয়াম এম্পেরারের ভারত আগমন)	
১৯২৬	ঐ	ইনকারনেশন	
১৯২৭	পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র	দেবদাস	চিত্রগ্রাহক
১৯২৮	ঐ	বিচারক	ঐ
১৯২৯	ঐ	বুকের বোঝা	ঐ এবং পরিচালনা
১৯৩০	ঐ	চোরকাঁটা	ঐ
১৯৩০	ঐ	চাষার মেয়ে	ঐ
১৯৩১	ঐ	দেনাপাওনা	ঐ এবং টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার

১৯৩১	ঐ	মুহাবাঁত কি আঁসু	ঐ	(হিন্দি)
১৯৩২	ঐ	চণ্ডীদাস	ঐ	
১৯৩২	ঐ	কপালকুণ্ডলা	ঐ	
১৯৩৩	ঐ	রাজরানী মীরা	ঐ	
১৯৩৩	ঐ	সুবাহ কা সিতারা	ঐ	(হিন্দি)
১৯৩৩	ঐ	ইহুদি কি লেড়কী	ঐ	ঐ
১৯৩৩	ঐ	পল্লীসমাজ	ঐ	
১৯৩৩	ঐ	চণ্ডীদাস	ঐ	এবং পরিচালনা (হিন্দি)
১৯৩৪	ঐ	ডাকু মনসুর	ঐ	ঐ
১৯৩৫	ঐ	ভাগ্যচক্র / ধূপছাঁও	ঐ	ঐ ও চিত্রনাট্য
১৯৩৭	ঐ	দিদি	ঐ	ঐ ও ঐ
১৯৩৭	ঐ	প্রেসিডেন্ট	ঐ	ঐ ঐ
১৯৩৮	ঐ	দেশের মাটি/ধরতী মাতা	ঐ	ঐ ঐ
১৯৩৯	ঐ	দুষ্মন/জীবন মরণ	ঐ	ঐ ঐ
১৯৪১	ঐ	পরিচয় / লগন	ঐ	ঐ ঐ
১৯৪৩	ঐ	কাশীনাথ	ঐ	ঐ ঐ
১৯৪৩	ঐ	বিচার	ঐ	ঐ ঐ
১৯৪৩	ঐ	পরায়া ধন	ঐ	ঐ ঐ
১৯৪৪	ঐ	মুজরিম	ঐ	ঐ ঐ
১৯৪৫	ঐ	মজদুর	পরিচালনা	
১৯৪৭	ঐ	নৌকাডুবি / মিলন	ঐ	
১৯৪৮	ঐ	দৃষ্টিদান	ঐ	
১৯৫০	ঐ	সমর / মশাল	ঐ	
১৯৫১	ঐ	দিদার	ঐ	
১৯৫৩	ঐ	দর্দ-এ-দিল	ঐ	
১৯৫৪	ঐ	ওয়ারিশ	ঐ	
১৯৫৬	ঐ	চার দোস্ত	ঐ	
১৯৫৭	ঐ	মাধবীর জন্য	ঐ	
১৯৫৭	ঐ	যোগাযোগ	ঐ	
১৯৫৭	ঐ	কাঠপুতলী	ঐ	(পরিচালক অমিয় চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর)
১৯৬১	ঐ	গঙ্গা যমুনা	ঐ	
১৯৬২	ঐ	উমিদ	ঐ	
১৯৬৩	ঐ	নর্তকী	ঐ	
১৯৬৪	ঐ	দুজ কা চাঁদ	ঐ	
১৯৬৬	ঐ	হাম কাঁহা যা রহেঁ হ্যাঁয়	ঐ	
১৯৭৭	ঐ	সমানতা	ঐ	

জন্ম ২৬ এপ্রিল ১৮৯৭-মৃত্যু ১৪ এপ্রিল ১৯৮৬ পুনে এফ টি আই আই-এর অ্যাডভাইসর প্যানেলের সদস্য ১৯৭৭ সালের দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার বিজেতা